মুক্তির পথে

মো : নূরে আলম

যাহ্‌রা একাডেমী কোম- ইরান

মুক্তির পথে

মোঃ নূরে আলম

প্রকাশনায়

যাহরা একাডেমী বাড়ি নং- ২০, রোড নং- ১৩, দৌরী শাহর, কোম, ইরান।

পরিবেশনায়

মাওলা আলী (কাঃ) একাডেমী

রেলগেট, আলীগড়, পোঃ চাঁচড়া, থানাঃ কোতয়ালী, জেলাঃ যশোর- ৭৪০২।

প্রকাশকাল

১৮ই জিলহজ্ব ১৪২৬ হিজরী

১৯শে জানুয়ারী ২০০৬ ইসায়ী

২২শে ভাদ্র ১৪১২ বাংলা

উৎসর্গ

মুক্তিকামী মানুষের পথের দিশা দেখাতে মহাপ্রভু মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে অনবরত তাঁর মনোনীত মহাপুরুষদের প্রেরণ করেছেন। তাঁদেরই অনুসৃত পথের কান্ডারী, মুক্তিপ্রার্থী জনতার আশার আলো, বর্তমান যামানার ইমাম ও নেতা - **ইমাম মাহদী (আঃ)**- এর পবিত্র সত্তার প্রতি।

১

হযরত আল্লামা ওস্তাদ সাইয়্যেদ হুসাইন মুর্তযা নাকাভীর প্রশংসাবাণী

[হযরত আল্লামা সাইয়্যেদ হুসাইন মুর্তুযা নাকাভী ভারতের লাখনৌ'র অধিবাসী এক খ্যাতনামা ধর্মীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা হযরত আল্লামা আয়াতুল্লাহ আল্ উযমা সাইয়্যেদ মুর্তুযা হুসাইন সাদর আল্ আফাযিল (১৩৪৬হিঃ - ১৪০৭হিঃ) ছিলেন তৎকালীন একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ। তাঁর বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ আরাবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে।
পাকিস্তান বিভক্তির পর তিনি লাখনৌ থেকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের ইসলামী সংস্কৃতির লালন ভুমি ও আল্লামা ইকবালের চারণ ভূমি লাহোরে স্বপরিবারে হিজরত করেন এবং মৃত্যু অবধি তিনি এখানেই বসবাস করে গেছেন। তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে। আল্লাহ্ তার আত্মার প্রশান্তি দান করুন। (লেখক কর্তৃক ''আ'ইয়ানুশ শিয়া'', খণ্ড ৭, পৃঃ ৩২৪থেকে সংগৃহীত ৩২৫-)
তারই সুযোগ্য সন্তান 'যাহরা একাডেমী'- র প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সাইয়্যেদ হুসাইন মুর্তুযা নাকাভী (মাদাঃ)। তিনি বর্তমান ধর্মীয় নগরী ক্বোমের একজন উচ্চস্তরের ফক্বিহ ও বিজ্ঞ আলেম হিসেবে সুপরিচিত। তারই অভিভাবকত্বে পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী 'যাহরা একাডেমী'- র সাংস্কৃতিক অভিযান।]

মহান আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ তার সকল সৃষ্টির মাঝে অফুরন্ত ও সীমাহীন। মানবজাতির উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের সীমাহীনতা শুধুমাত্র সংখ্যার হিসেবেই নয় বরং এর রকমভেদও প্রচুর। আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে এমন সব অনুগ্রহ দান করেছেন যা অন্য কোন সৃষ্টিতে দান করেননি। এসব অনুগ্রহের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আক্বল বা বুদ্ধিবৃত্তি।
বুদ্ধিবৃত্তি এমন এক অনুগ্রহ যার সঙ্গে দ্বীন ও লজ্জা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সৃষ্টি জগতে আমরা যে ভিন্নতা ও বৈচিত্রতা পরিলক্ষিত করি তা বুদ্ধিবৃত্তিরই এক অলৌকিক প্রভাব।

এখানে উল্লেখ করা হলো দ্বীন ও লজ্জা হচ্ছে আক্কলের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু - এর কারণ কি? উত্তরে বলা যায়, বুদ্ধিবৃত্তির বাহক এ মানুষকে উক্ত দু'টি জিনিসই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানুভবতার সুমহান মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেয়। আর এ মর্যাদা ও মহানুভবতার দাবী হচ্ছে যে, সে সর্বদা লজ্জাবনত থাকবে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান সেই মহা অনুগ্রহকারীর সমক্ষে। এ কারণে কৃতজ্ঞতা ও লজ্জাবনতারই অপর নাম হচ্ছে তাক্কওয়া বা খোদাভীতি।

হযরত আলীর মতে দ্বীনি শিক্ষার সূচনা হচ্ছে আল্লাহর উপর ঈমান। আল্লাহর উপর ঈমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে সকল উন্নতি ও অগ্রগতির মূল উৎস ও মানবতার মুক্তিদূত। সে- ই ভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি অপরাপর লোকজনের মাধ্যমে মানুষকে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

'যাহরা একাডেমী' এমন এক সংস্থার নাম যেখানে কতক চিন্তাবিদ ও বিদ্বান ব্যক্তি সংঘবদ্ধভাবে জাহেলিয়াতের অন্ধকারের মাঝে নাজাতের পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মশাল হাতে মানবজাতিকে পথ- নির্দেশনার গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এদেরই অন্যতম আমাদের প্রিয় যুবক, দ্বীনের আলেম, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন মাওলানা মোঃ নূরে আলম (সাল্লামাহুল্লাহু) তিনি জ্ঞানের সুগভীর মহাসাগরে অবগাহন করে জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনে যথেষ্ট পরিশ্রমের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এ মহা সাগরে ডুব দিয়ে মহামূল্যবান অনেক হীরা- মাণিকও হস্তগত করেছেন। এক্ষনে তিনি সেই মহারত্ন থেকে নির্বাচন করে একটি ক্ষুদ্র ঝাড়বাতি সাজিয়েছেন যার মাধ্যমে তিনি তার স্বদেশী মুসলমানসহ মানবজাতির গবেষকদের জন্যে মুক্তির পথ এমনভাবে সুস্পষ্ট করেছেন যে তা শুধু পথই আলোকিত করবে না বরং সে পথের আকর্ষণও কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিবে। তিনি তার বইয়ের নামকরণ করেছেন "মুক্তির পথে"। এই গবেষণার পথে মাওঃ নূরে আলম যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন। আর এক্ষেত্রে জনাব হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন শেখ আস্- সামী আল্ গুরাইরী (আবু আনফাল) সাহেব তাকে দিক নির্দেশনার ব্যাপারে কোন প্রকার ক্রুটি করেননি বরং তিনি একজন দয়ালু ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং উদ্ধৃতি সমূহের উপর নজর রেখেছেন পরিশ্রমের সাথে। ফলে উক্ত বাতির সৌন্দর্য আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

‘যাহরা একাডেমী’- র সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে আমি এবং আমাদের একাডেমীর সম্মানিত প্রধান পরিচালক জনাব হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন আল্লামা আলহাজ্ব শেখ সাব্বির হাসান মেইসামী, উক্ত গবেষকদ্বয়ের প্রতি জানাই অশেষ ধন্যবাদ। আর আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন বিশ্ব মুসলিমকে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে মানবতার কল্যাণ ও পরিপূর্ণতার সকল সরঞ্জাম সুবন্দোবস্ত করার তৌফিক দান করেন। সাথে সাথে একাডেমীর সকল সদস্য ও গবেষক, বিশেষতঃ এ গ্রন্থকার ও তার লেখার দিক নির্দেশকের ঐকান্তিকতা ও দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ বৃদ্ধির জন্যে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

সাইয়্যেদ হুসাইন মুর্তুজা নাকাভী

২৭ শে শা’বান ১৪২০ হিঃ

হাওযা- ই- ইলমিয়া, কোম

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান।

২

অধ্যাপক আসসামী আল্ গুরাইরীর বক্তব্য

উপস্থিত এ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়াবলীর প্রধান লক্ষ্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার ও বিকাশ সাধন। কেননা ইসলাম হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি সংশ্লিষ্ট জীবন্ত একটি দেহের আবরণের ন্যায়। তাই ন্যায়সংগত কারণেই ইসলামী চিন্তা- বুদ্ধি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

ক) ঐশ্বরীক ও বৈষয়িক বুদ্ধিবৃত্তি।

খ) অলৌকিক ও উদ্ভাবনাময়ী বুদ্ধিবৃত্তি।

গ) বিজ্ঞ বুদ্ধিবৃত্তি ও বর্ণনাময়ী বুদ্ধিবৃত্তি।

ঘ) বিশ্বাসগত বুদ্ধিবৃত্তি ও সমালোচক বুদ্ধিবৃত্তি এবং

ঙ) ধারণাগত বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানগত বুদ্ধিবৃত্তি।

আপনাদের সামনে উপস্থিত বর্তমান গ্রন্থটি বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ লাভে পরিমিত সাহায্য করতে সক্ষম। লেখক এ বইটিতে অত্যন্ত শক্তিশালী তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। কোন অন্ধ অনুকরণ এবং বিশ্বাস সম্পর্কিত উদ্দীপনাময়ী ও চলমান গতানুগতিক আলোচনা এতে স্থান পায়নি বরং গ্রন্থটির সকল আলোচনাই হয়েছে সম্পূর্ণ সত্য এবং সুপ্রমানিত তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে। আমরা সুস্থ বুদ্ধি ও বিবেককে কখনো বিতাড়িত করি না বরং একই সঙ্গে রাসূল (সঃ) কর্তৃক বর্ণিত দলীলের উপর স্থবির বুদ্ধিবৃত্তি এবং মানব বুদ্ধিবৃত্তির সমান ব্যবহারের পক্ষপাতি। কেননা তালাবদ্ধ চিন্তা- ভাবনা থেকে মুক্তির চাবি কাঠি হচ্ছে এ বুদ্ধিবৃত্তি। ফলে এরই মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে পারি। সাথে সাথে এ বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে এও বলে দেয় যে কোন্ বিষয়টি বিবেক প্রসূত আর কোনটি বিবেক- বহির্ভূত। এ গ্রন্থে বিভিন্ন সহজ বোধগম্য উদাহরণের মাধ্যমে চিন্তার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে যথার্থভাবে, যেন পরবর্তীতে অন্যান্য চিন্তাবিদ ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ এ পথে নিজেদের পরিশ্রম ব্যয় করতে এগিয়ে আসেন। পরিশেষে আমি লেখকের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

- আসসামী আল্ গুরাইরী

৩
প্রাথমিক কথা

হতাশাগ্রস্থ এ পৃথিবী। মুক্তির সন্ধানে দিক-বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আজকের মানবকুল। ফলে কখনো পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদের মরিচিকায় আটেক পড়ছে আবার কখনো প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদের ধুম্রজালে বন্দি হয়ে শ্বাসরুদ্ধকর ও মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে মানুষ। কিন্তু তারা মুক্তি কি পেয়েছে? এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, কোন তন্ত্র বা মতবাদ-ই মানব কল্যাণের সকল দিক বিবেচনা করে রচিত হয়নি। আর তাই এমতাবস্থায় এ সকল মতবাদের নিশ্চিত পরিণাম হিসেবে বর্তমান বিশ্বকে উপহার দিয়েছে নিরাপত্তাহীনতা, অশান্তি ও অরাজকতা। ফলে পথহারা হয়ে মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির সন্ধানে।

একজন আইন প্রণয়নকারীর জন্যে প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে নিখুত ও পরিপূর্ণ জ্ঞান ধারণ করা। আর এ কাজটি একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর-ই জন্যে সম্ভব। সুতরাং তার আইন অনুসরণের মাধ্যমেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা রচিত আল্-কোরআন আমাদের জন্যে ইহকালের কল্যাণ ও পরকালের মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। আল-কোরআন হচ্ছে মানবজাতির মুক্তির সনদ। তাই আজকে সময় এসেছে সেই মহান সৃষ্টিকর্তাকে নূতন করে চেনার। মানব রচিত বিভিন্ন অসাড় তন্ত্র-মন্ত্রের বেড়াজাল ভেঙ্গে প্রকৃত কল্যাণদাতা মুক্তিদাতার সত্যকার পরিচয় জানা আজকের মুক্তিকামী মানুষের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমান পুস্তকটি সকল কল্যাণকামী ও শান্তিকামী মানুষের চিন্তার কপাট উম্মুক্ত করে বিশুদ্ধ ও বিকশিত জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রকৃত ও সঠিক পরিচয় এবং তাঁর গুণাবলীর খাঁটি অনুভূতি কোনক্রমে বিভিন্ন পরিভাষায় সীমাবদ্ধতায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের সৃষ্টি এ পরিভাষা আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধিতে যতটুকু সম্ভবপর হয়েছে, তাঁর প্রকৃত পরিচয়ের কিছু ধারণা উপলদ্ধি বোধের কাছাকাছি করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

যারা ধর্মহীন তথা সেকুলার জীবন যাপনে অভ্যস্থ, যারা বাস্তবাদী চিন্তা চেতনায় নিজেদের মন-মগজকে ভরে দিয়েছে তারা এ পুস্তক পাঠে উপকৃত হয়ে ধর্মীয় জীবনে ফিরে আসতে পারেন। কেননা ধর্মের মূল প্রবর্তক এ বিশ্বের বিধানকর্তা। যেমনি করে বিশ্ব- বিধাতার 'তাকভীন' তথা সৃষ্টিজগতে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁরই প্রবর্তীত বিধান অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালিত হচ্ছে তেমনি করে 'তাশরীয়ি' জগতে তথা তাঁর সৃষ্টির সেরা জীবের জন্যেও নির্দিষ্ট বিধিবিধান অবতীর্ণ করেছেন। আর এ সকল বিধি- বিধানের সমষ্টিই হল ধর্ম। ব্যক্তি জীবন থেকে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে খোদায়ী বিধান মানুষের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের জন্যে প্রবর্তন করেছেন মহান প্রভু। তাই তাঁকে চিনে তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে একটি মানুষের শুরু হয় ধর্মীয় জীবনের যাত্রা। একজন মানুষ যখন অন্তরাত্মা দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করবে যে তার স্রষ্টা ও প্রভু সর্বদা সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান তাকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রন করছে, তখন সে বেহাল্লাপনা ও লাগামহীন জীবন যাপন ত্যাগ করে বিশ্ব প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পন করে তাঁরই বিধি-বিধান মাথা পেতে নিতে বাধ্য হবে। আর এভাবেই একজন মানুষ তার প্রকৃত আত্ম পরিচয়ের সন্ধান লাভে সমর্থ হবে। অপরদিকে যারা ধর্মীয় জীবন- যাপন তথা ধর্মীয় অনুশাষন মেনে চলেছেন তারাও যদি এ বইটি পাঠ করেন তাহলেও তাদের ধর্মীয় জীবনে একগুয়েমীতা, অজ্ঞতা, খামখেয়ালীপানা ও স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে চলা অনিচ্ছায় এবং অজান্তে ধর্মীয় জীবন পালনের ক্ষেত্রে একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা পুনরায় ফিরে আসতে পারে। এ পুস্তকে আলোচনার বিভিন্ন ধাপে অনেক সময় কিছু তুলনামূলক দার্শনিক ও কঠিন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, যদিও বইটি সকলের সহজ বোধগম্যতার প্রতি দৃষ্টি রেখে লেখার চেষ্টায় কোন প্রকার ক্রটি করা হয়নি। তারপরও সকল স্তরের বাংলা ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ যেন আমার এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন সে জন্যে এ ক্ষেত্রে কঠিন ও সহজ তথা উভয় প্রকার আলোচনার সুত্রপাত করা হয়েছে।

আজকের অশান্ত পৃথিবীতে মানুষ যেন তার প্রকৃত স্রষ্টা ও ত্রাণকর্তাকে চিনে মুক্তির পথকে সুগম করতে পারে সে কারণেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। মানবতার কল্যাণে একটি নূতন দিগন্ত উম্মোচন

করুন এ পুস্তকে সে কামনাই করছি। অবশেষে সুপ্রিয় পাঠক মহলের সেবায় নিবেদিত আমার এ যৎসামান্য শ্রমটুকু সার্থক হলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। -

মোঃ নূরে আলম।

৪

এ বিশ্ব

বিশ্ব- সৃষ্টি কতই না সুন্দর! মনোরম সব কিছু। নিখুঁত ভাবে সাজানো রয়েছে এ জগতের প্রতিটি বস্তু। নভোমন্ডল, গ্রহসমূহ, নক্ষত্ররাজি, বায়ুমন্ডল, নদ- নদী, সাগর- মহাসাগর, বন- জঙ্গল ও পাহাড়- পর্বত সব কিছুই এক নির্দিষ্ট পথে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিভ্রমণ ও পরিচালিত হচ্ছে।

পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর বস্তুনিষ্ঠ সত্তা নিয়ে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা করলে স্পষ্টত- ই আমাদের কাছে সে বস্তুর অন্তর্নিহিত সব সৃষ্টি নিপূণতা ও রহস্য উদঘাটন হয়ে যায়। তবু এখনো বহু প্রাণী সমুদ্রের তলদেশে অজানা রয়ে গেছে যা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে অক্ষম এখনও অথবা প্রাপ্ত প্রাণীর গুপ্ত নিপূণতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেবহাল হতে আরো প্রচুর সময়ের প্রয়োজন বলে মনে করেন।

এ বস্তজগতের প্রতিটি প্রাণী ও বস্তু রহস্যময়। এর সৃষ্টি ধারা, আকৃতি ধারণ, জন্ম লাভ ও বৃদ্ধির সূচারু কার্যপ্রণালী সমস্ত কিছুই আমাদের বুদ্ধির গভীরে বিশদভাবে নাড়া দেয় এবং চিন্তাশীলদের চিন্তায় তাক লাগিয়ে দেয়।

সূর্য একটি গোলাকার অগ্নিকুন্ড যা অনাদিকাল থেকে আলো ও তাপ দিয়ে পৃথিবীর জীব ও জগতকে প্রভাবিত করছে। সমুদ্রের ঢেউ, নদীর জোয়ার ভাটা ইত্যাদি সকল কিছু এমনকি মানুষের প্রতিটি স্পর্শকাতর অঙ্গ- প্রতঙ্গ পর্যন্ত সূর্য দ্বারা প্রভাবিত। চন্দ্র আলো বিকিরণ করে রাত্রের অন্ধকারে। পাহাড়- পর্বত ভূ- পৃষ্ঠে খুঁটির কাজ করছে। গাছপালা, তরুলতা, বন- জঙ্গল ইত্যাদি পৃথিবীতে বায়ূ দূষণ প্রতিরোধ করে চলছে। আবার মানুষ ছাড়াও ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে, সাগরের তলদেশে ও উপরিভাগে রয়েছে নান প্রকারের আশ্চর্য প্রাণী। ভূ- পৃষ্ঠের মৃত্তিকা এবং এর রংয়ের প্রকারভেদও প্রচুর। নদ- নদীও সাগরেও রয়েছে কত প্রকার স্বাদের জল। আর বিশ্ব প্রকৃতির যা কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা অন্যান্য গ্রহসমূহের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র যা পৃথিবী নামে পরিচিত। এরই মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। মানব দেহের প্রতিটি

অংশই বিস্ময়কর। আমাদের মস্তিষ্কের ব্রেন সম্বন্ধে সামান্য বিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যালোচনা একজন মানুষকে নির্বাক করে দিতে সক্ষম। মানব মস্তিস্কে অবস্থিত স্মৃতিশক্তির বিষয়টা আরো বিস্ময়কার। মানুষের দেহাভ্যন্তরে হৃৎপিন্ড, কিডনী, পাকস্থলী .... সব কিছুই এক বিশাল জগতের অবতারণা।

এ পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিতে আমরা যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সুসংহতি প্রত্যক্ষ করি তা সাধারণ ও বুদ্ধিজীবি তথা এ উভয় স্তরের মানুষের বিবেক-বিচক্ষণতায় কৌতুহলী জিজ্ঞাসার উদ্রেক ঘটাতে পরিপূর্ণ সহায়ক।

পৃথিবী গতিশীল। পরিবর্তনশীল ও ঘূর্ণায়মান। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। আর এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তু ও প্রাণী নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে গতিশীল অবস্থায় রয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে প্রকৃতির এ সমস্ত দিকগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এতসব কিছুর মাঝে আমরা যে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি তা হল, বিশ্ব প্রকৃতির সর্বস্তরে এক প্রকার শৃঙ্খলা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নিয়মনীতি বিরাজমান। এ ব্যাপারে আপনাদের সামনে সৃষ্টিজগতের মাত্র দু'টি উপমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছি।

৫

সৃষ্টিজগতের বিস্ময়কর উপমা

বাদুড় পাখি

পুষ্প ও কীট পতঙ্গ

বাঁদুড় পাখি

কখনও কখনও অন্ধকার রাত্রে একটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রাণীর আনাগোনা দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা দেখতে পাই রাত্রের গভীর অন্ধকারের মধ্যেও এ পাখি সাহসিকতার সাথে খাবারের সন্ধানে এদিক সেদিক ছুটে বেড়ায়। ঘুট ঘুটে অন্ধকার। রাত্রে যখন কোন কিছুই দৃষ্টিগোচন হয় না তখন এরই মাঝে নির্ভয়ে উড়ে বেড়ায় একটি ছোট্ট পাখি। রাতেই তার বিচরণ সময়। খাবার যোগাড় করে সে রাত্রেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর শিকার এ গভীর ও ঘন অন্ধকারেই করে থাকে সে। এ ছোট্ট পাখিটির নাম বাঁদুড়। প্রকৃতিতে এটি একটি বিষ্ময়কর প্রাণী। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হলো ঘুট ঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে এর বিচরণ।

এ দ্রুতগতি সম্পন্ন ক্ষুদ্র পাখি রাতের আঁধারে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় না। এটা কতই না বিষ্ময়কর! এ ব্যাপারে যতই পর্যবেক্ষণ ও অধ্যায়ন করা হয় ততই এর অন্তর্নিহিত ও গুপ্ত রহস্য আমাদের সামনে আরো অধিক পরিমাণে উদঘাটন হয়ে পড়ে। দিবালোকে একটা দ্রুত উড্ডয়নশীল পাখি যে ভাবে নির্ভয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায় এ ক্ষুদ্র বাদুড় পাখিটাও সেভাবে অন্ধকার রাতে নির্ভয়ে আকাশে উড়ে বেড়াতে সক্ষম।

আমরা জানি এ পাখির কোন চোখ নেই। তবুও রাতের অন্ধকার তার জন্যে সমস্যাই নয়। যদি তার উড্ডয়নের পথে প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে কোন প্রকার তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম না থাকে তাহলে কিভাবে সে এত অকুতোভয়? কোথাও তো আঘাত লেগে গতিরোধ হচ্ছে না?

দেখা গেছে যদি এ পাখিটাকে কোন আঁকাবাঁকা ও অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে ছেড়ে দেয়া হয় আর সুড়ঙ্গ পথের দেয়ালগুলোতে কালি মেখে রাখা হয় তারপরও এ বিষ্ময়কার প্রাণীটি খুব সুন্দরভাবে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় সুড়ঙ্গের অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম। বাদুড় পাখির মধ্যকার এ বিষ্ময়কর অবস্থার সাথে আধুনিক বিশ্বের আবিষ্কার রাডার[১] নামক যন্ত্রের তুলনা করা যেতে পারে। বাঁদুড় পাখি সৃষ্টিকর্তার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। এর অন্তর্নিহিত ব্যবস্থাপনার গভীরতা উপলব্ধির জন্যে রাডার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা থাকা প্রয়োজন। সাধারণত:

পদার্থ বিদ্যায় শব্দের অধ্যায়ে 'মহাশব্দ বা অতিশব্দ' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ মহাশব্দের তরঙ্গমালা এত দ্রুতগতিসম্পন্ন ও দীর্ঘ যে মানুষের দ্বারা কোন ক্রমে তা কর্ণগোচন সম্ভব নয়। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যখন কোন দেয়ালে ছুড়ে মারা হয় তখন তা ঠিক নিক্ষেপের গতিতেই পূর্বস্থানে ফিরে আসতে বাধ্য। যখন আমরা কোন পাহাড়ের নিকট গিয়ে চিৎকার করি তখন এর ধ্বনি একট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পূর্বস্থানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তদ্রুপ কোন মহাশব্দের তরঙ্গ একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে নিক্ষেপ করা হলে তা নির্দিষ্ট গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যখনই কোন কিছুতে বাধাগ্রস্থ' হয় তখনই তা পূর্বের অবস্থানের দিকে ফিরে আসে। সচরাচর যুদ্ধের সময় শত্রু বিমানকে চিহ্নিত করার জন্যে এ ধরণের রাডার থেকে একটা বিশেষ শব্দ বিমানের উদ্দেশ্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে। আর যখনই তা শত্রু বিমানে আঘাত প্রাপ্ত হয় তখনই একটা নির্দিষ্ট গতিতে প্রত্যাবর্তন করে রাডার যন্ত্রে। এরই মাধ্যমে শত্রু বিমানের গতিবেগ, দুরত্ব ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বাদুড় পাখির দেহে রাডারের ন্যায় একটা যন্ত্র বিদ্যমান। তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন যদি বাদুড় পাখিকে একটা শুন্য কক্ষে ছেড়ে দেয়া হয় আর সেখানে মহাশব্দ ধারণ ও তা সাধারণ শব্দের তরঙ্গে পরিণত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন মাইক্রোফোন রাখা হয় তাহলে পরিষ্কারভাবে রাডার থেকে নির্গত মহাশব্দ শ্রবণ সম্ভবপর হয়ে উঠবে। প্রতি সেকেন্ডে ত্রিশ থেকে ষাট বার মহাশব্দের তরঙ্গ বাদুড় পাখির নিকট থেকে শোনা যায় বলে তারা ধারনা করে থাকেন।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে বাদুড় তার বাকযন্ত্র থেকে শব্দ নির্গত করে তা নাসিকার মাধ্যমে বাইরে ছেড়ে দেয়। আর তা কোন স্থানে বাধাগ্রস্থ হয়ে ফিরে আসে কর্ণে। বাদুড়ের কর্ণ নির্গত তরঙ্গরাজীর ধারক। এ পাখি তার কর্ণের মাধ্যমেই উপলব্ধি করতে পারে কতটুকু দুরত্বে বাধাগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ ক্ষুদ্র প্রাণী রাতের অন্ধকারে শিকারের খোঁজে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। কি অবাক সব ক্রিয়া- কান্ড! এতসব জটিল ব্যবস্থাপনা কি কোন একজন বুদ্ধিমান ও সর্বজ্ঞানী ব্যবস্থাপক ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা সম্ভব? আর কোন বুদ্ধিহীন ব্যবস্থাপক তো এ ব্যাপারে কোন ধারণাই রাখতে পারে না। সৃষ্টি জগতের এ বিশাল নৈপূণ্য ক্ষমতা ও

জটিলতা দর্শনে এ অবধি অনেক বিজ্ঞানী এমন কোন একক মহাস্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, যিনি সকল প্রকৃতির উর্দ্ধে।

পুষ্প ও কীট পতঙ্গ

প্রাকৃতিক জগতে আরেকটি অত্যাশ্চর্য বিষয় হচ্ছে পুষ্প ও কীট পতঙ্গের মাঝে বন্ধুত্ব। বসন্তকালের শেষের দিক যখন ধীরে ধীরে বাতাস গরম হতে শুরু করে তখন ফলের বাগান গুলোতে বিভিন্ন প্রকার কীট পতঙ্গের আনাগোনা দেখা যায়। ছোট- বড় পতঙ্গ, প্রজাপতি, মৌমাছি ইত্যাদি কত রকমের প্রাণী। এধরণের প্রাণীর কাজ হলো এরা কোন এক গাছের ফুলের উপর বসে রস আহরণ করে অন্য গাছের পাপড়ির উপর গিয়ে বসে। ওরা পুঃলিঙ্গের গাছের পাপড়ি থেকে পরাগরেণু বহন করে নিয়ে যায় স্ত্রী লিঙ্গের পুষ্পের উপর। এভাবে বৃক্ষরাজীর মাঝে সঙ্গম ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরিণতিতে বৃক্ষরাজী ফুলে- ফলে ভরপুর হয়ে উঠে।

এ সময়ে বিভিন্ন প্রকার কীট- পতঙ্গের আনাগোনা, এক ডাল থেকে অন্য ডালে বিচরণ, গাছে গাছে উড়ে বেড়ানো ইত্যাদি দেখে মনে হয় কোন এক বিশেষ শক্তি তাদেরকে ঠিক একটি উৎপাদনশীল শিল্প কারখানার শ্রমিকদের ন্যায় পরিচালনা করছে। ফলে সকলে নিজ কর্মে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করে আছে। কাজের কোন ফাঁকি নেই। পরিশ্রম করছে সবাই একযোগে। যথাযথভাবে সকলে স্ব- স্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কতই না বিষ্ময়কর এ বিষয়টি !

কখনো কি ভেবে দেখেছি, যেখানে বৃক্ষ, তরুলতার নড়াচড়া ও স্থান পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই সেখানে ওগুলো কি ভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় আর কি পদ্ধতিতে তাদের সঙ্গমক্রিয়া সম্পন্ন হয়? কিভাবে বৃক্ষরাজীর মাঝে পুরুষ পরাগরেণু ও স্ত্রী ডিম্বানুর মিলন ঘঠে? অনেক ক্ষেত্রে এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজটির দায়িত্ব কীট পতঙ্গের উপর ন্যস্ত। আবার কখনো বায়ু এ মিলন ক্রিয়াতে সাহায্য করে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি কীট- পতঙ্গ ও বৃক্ষরাজীর মধ্যকার এ বিষ্ময়কর ঘটনাবলী অধ্যয়ন করে তখন স্বভাবতঃই তার মনে প্রশ্নের উদেয় হয়, কে কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষদের মাঝে এ অপুরম ও মজবুত বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিয়েছে?

আমাদের চারপার্শ্বে রয়েছে এ ধরণের বহু আশ্চর্য ঘটনা যা বিশ্বকে দান করে এক সাবলীল সৌন্দর্য ও বিশেষ নিয়ম- শৃঙ্খলা। বিশ্বজগত চমৎকার ও বিষ্ময়কর সৃষ্টিতে ভরপুর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন সৃষ্টিকে নিয়ে যদি আমরা সামান্য পরিমাণ অধ্যয়ন, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব বহু অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া- কান্ড, সুনিপুণ কলা- কৌশল ও ব্যবস্থাপনা। এ প্রসঙ্গে কোরআন উল্লেখ করছে :

(يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

অর্থাৎ : (আল্লাহ্) তোমাদের জন্যে ওটার (বৃষ্টির) মাধ্যমে কৃষিকার্য উৎপাদন এবং জলপাই, খেজুর ও আঙ্গুর ইত্যাদি সব ধরণের ফলাদি বৃক্ষ সমুদগত করেন, নিশ্চয়ই এগুলোর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।(আন্ নাহল, আঃ নং- **১১**)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন-

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)

অর্থাৎ : নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীন এবং দিবা- রাত্রির পালা বদল এবং মানুষের উপকারার্থে চলন্ত জাহাজসমূহ এবং আল্লাহ্ কর্তৃক আসমান থেকে বারিবর্ষন যার ফলে মৃত যমীন পুনরায় প্রাণ ফিরে পায় এবং যমীনের বুকে চতুষ্পদ জন্তুর উত্থান আর বায়ুরাশির গতি পরিবর্তন এবং আসমান ও যমীনের মাঝখানে সংরক্ষিত ও করতলগত মেঘ খণ্ড চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।(আল্ বাক্বারা, আঃ নং- **১৬৪**।)

৬

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি

শিশু জন্মলগ্ন থেকেই তার চার পাশে অনেককে দেখতে পায়। সর্বপ্রথম যার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে তিনি হলেন নবজাত শিশুর মা। ধীরে ধীরে যখন শিশু বড় হতে থাকে তখন সে মা ছাড়াও আরো অনেকের সাথে পরিচয় লাভ করে। আস্তে আস্তে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর সাথেও পরিচিত হতে থাকে। এভাবে শুরু হয় একটি শিশুর জীবনযাত্রা।

মানুষ স্বভাবগত ভাবেই কৌতুহলী। তার চারপাশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে জানার কৌতুহলী মনোভাব শৈশবেই প্রতিটি শিশুর মাঝে পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে সে ক্ষুদ্র জিনিষ থেকেই শুরু করে, পরে বয়স যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই জীজ্ঞাসার মাত্রা ও পরিমাপও বেশী হতে থাকে।

একটি শিশু যখন পাঠশালায় গমন করে তখন সে তার চতুষ্পার্শ্বে অনেক ধরনের সৃষ্টির সাথে পরিচয় লাভ করে। আর প্রথম থেকেই তো এ আকাশ তার মাথার উপর ছেয়ে আছে। অক্সিজেন অনবরত গ্রহণ করছে। পানি পান করছে। এভাবে সে ধীরে ধীরে পাহাড়- পর্বত ও নদ- নদী এবং অনেক ধরনের গৃহপালিত পশু- পাখির সাথে পরিচয় লাভ করতে থাকে। ঐ শিশুর কৌতুহলী মনে একটি মাত্র জিজ্ঞাসা এত সব কিছু, কে সৃষ্টি করলো? সৃষ্টির পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে? সূর্য প্রভাতে পূর্বাকাশে উদয় হয় আবার সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমাকাশে অস্ত যায় প্রতিদিন, এ নিয়ম- শৃঙ্খলা কে তৈরী করলো? রাত্রে যখন সে আকাশের তারকারাজীর দিকে তাকায় তখন আবারও তার মনে প্রশ্নের উদেয় ঘটে, এত সুন্দর মনোরম নক্ষত্রমণ্ডলীকে কনো অভিজ্ঞ চিত্রকর আকাশের বুকে সাজিয়ে রেখেছে? এসব প্রশ্নের উত্তরই হল বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্ব অস্তিত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিই হল অন্তরের এতসব প্রশ্নের উত্তর।

অনেকে বিশ্বাস করেন এ বিশ্বের সৃষ্টির পেছনে কোন পরিকল্পনা প্রণেতার প্রয়োজন নেই। এর পেছনে কোন উদ্দেশ্যও নেই। স্বয়ংক্রিয়ভাবে উদ্ভব হয়েছে এ সৃষ্টিজগত। প্রকৃতিই স্বয়ং সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। আর একেই বলে বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাক ইসলামী যুগে এ ধরনের

দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীদের বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হতো। তন্মোধ্যে প্রাকৃতিবাদী, যিনদিক, দাহরী ও নাস্তিক অন্যতম। কিন্তু বর্তমান আধুনিক, শিল্পোন্নত ও ইলেকট্রোনিক্স যুগে তাদের মুখোশ পরিবর্তন হতে দেখা যায়। বর্তমান বিশ্বে বস্তুবাদীদের বিভিন্নমুখী মতাদর্শের মধ্যে অতি পরিচিত নামটি হচ্ছে "যুক্তিবাদী বস্তুবাদ" বা "Dialectic Materialism"। আর মার্ক্সবাদী দর্শন এরই উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

আবার অনেকে বিশ্বাস করেন এ বিশ্ব জগতের বালু কণা থেকে শুরু করে প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে একটি নির্দিষ্ট কার্যকারণ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। কোন কিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়নি। বরং প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে কোন স্বাধীন সত্তার শক্তিমত্তা কাজ করছে। এ ধরনের চিন্তা ভাবনার নাম বিশ্ব সম্পর্কে আস্তিকবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি আর বিশ্ব পরিচিতি এক কথা নয়। এরা দুটি পৃথক পরিভাষা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পৃথিবীতে পানির পরিমান মাটির চেয়ে কতগুণ বেশী? অথবা সৌর জগতে বিরাজমান গ্রহের সংখ্যা কত? ইত্যাদি সৃষ্টি জগতের পরিচয় নিয়ে আলোচনা মাত্র। এগুলোতে বিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যখন আমরা সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করি, যেমন ধরুন যদি বলি যে, সমগ্র বস্তুজগত কোন অবস্তুগত সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভরশীল - তাহলে এ বিষয়টি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হবে।

৭

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানের উন্নতি

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশা

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, "আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তা তো আছেই। আমাদের বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এগুলোর তো কোন পরিবর্তন আসবে না। তাহলে এ বিষয়ে এত আলোচনার কি প্রয়োজন? এর আলোচনা আমাদের জন্যে কি ফলাফল বয়ে আনতে পারে?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, হ্যাঁ, আমাদের চারদিকে কোন সৃষ্টির উপর প্রভাব ফেলবে না সত্য, কিন্তু তাই বলে আমাদের কাজ- কর্ম, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হবে না এটা বলা মনে হয় সঠিক হবে না।

অধিকন্তু বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিষয়টির স্পষ্টতার জন্যে নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল।

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানের উন্নতি

চিন্তা করে দেখুন, আপনার বন্ধু সফর থেকে ফিরে এসেছে। সে আপনাকে একটি বই উপহার দিয়ে বললো এ চমৎকার বইটির লেখক একজন বড় চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ এবং উচ্চজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী। নিশ্চয়ই আপনি সে বইটা হালকাভাবে রিডিং পড়েই ক্ষান্ত হবেন না। বরং এর প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও তাদের গঠন বর্ণনা ও পরিবর্তন সবকিছুকে খুব সূক্ষ্মভাবে মনযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করবেন। যদি কোথাও না বুঝে থাকেন তা'হলে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পরদিন মোট কথা সুযোগ পেলেই এ বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন। সাধ্যমত পরিশ্রম করতেও আপনি কুন্ঠাবোধ করবেন না। কেননা, এ বইয়ের গ্রন্থকার কোন সাধারণ লোক নন। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় গবেষক, চিন্তাবিদ। তার কোন কথাই অযথা নয়। কোন বাক্যই তার অপরিকল্পিত নয়।

অপরদিকে যদি আপনাকে বলা হয় এ বইটা যদিও বাহ্যিকভাবে চমৎকার বলে মনে হবে কিন্তু এর পুস্তকার একজন অজ্ঞ, মুর্খ, নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। আপনি নিখুত ভাবে এ বইটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন নাকি শুধুমাত্র একটু চোখ বুলিয়ে রেখে দিবেন? কেননা আপনি জানেন এ বইয়ের কোন মূল্য নেই। কোন জ্ঞান- গর্ভ আলোচনা এ বইতে নেই। মোট কথা এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা অযথা সময় নষ্ট করারই নামান্তর বলে বিবেচনা করবেন। এ বিশ্বজগতও একটি বৃহৎ গ্রন্থের ন্যায়। এ জগতের প্রতিটি সৃষ্টি এক একটি বাক্য, যার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এ বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের।

যদি আমরা আস্তিকবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামী হই তাহলে এ বিশ্বের প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি সৃষ্টিকেই আমরা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবো আর খুব মনোযোগ সহকারে তাঁর প্রতিটি বিষয়ের অধ্যায়নে গুরুত্বারোপ করবো এবং কৌতুহলী অন্তঃকরণ নিয়ে প্রতিটি সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্যাবলী উদঘাটনের জন্যে উদগ্রীব হবো। কেননা আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি সৃষ্টি বস্তুর পেছনে নিশ্চয়ই কোন শক্তিশালী ও বিশাল বুদ্ধিমান শক্তিমত্তা বা সৃষ্টিকর্তা ক্রিয়শীল রয়েছেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাবান, শিল্পী ও জ্ঞানী। তিনি মহাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। সুতরাং তাঁর প্রতিটি

সৃষ্টিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। আর এ দৃষ্টিভঙ্গির কারনেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

আর যদি আমরা বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হই তা'হলে এ বিশ্বের রহস্যময় সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে সামান্যতম চিন্তা- ভাবণা করারও মনোভাব তৈরী হবে না। কেনান, বস্তুবাদীরা এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকারক হিসেবে বুদ্ধি ও জ্ঞানহীন প্রকৃতিকেই মনে করেন। আর এতসব কিছুর স্রষ্টা যদি এক নির্বোধ ও জ্ঞানহীন প্রকৃতি হয়ে থাকে তা'হলে তার সৃষ্টির- ই বা কি মূল্য হতে পারে?

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশা

কথায় বলে, "নদীর এপাড় ভাঙ্গে ওপাড় গড়ে - এই তো নদীর খেলা।" আর এ খেলা মানুষের জীবনেও ঘটে থাকে অহরহ। সাধারণতঃ মানুষের এ ক্ষণকালীন জীবনও বহু চড়াই- উৎরাই এর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। তাই কখনো একজন মানুষের জীবনের দ্বারে কিছু অনাকঙ্খিত বিপদও কড়া নাড়তে পারে। অনেক সময় এমনও হয় যে এ অপ্রত্যাশিত সমস্যা থেকে তার পালানের কোন পথ থাকে না। তখন চতুর্দিকে পথরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে যায় সে। এমতাবস্থায় সে নিজেকে অতিশয় দুর্বল ও অসহায় অবস্থার মুখোমুখি দেখতে পায়। আর এরকম কঠিন বিপদের মুহূর্তে একমাত্র আস্তিকবাদী দৃষ্টি- ভঙ্গিই তাকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। কেননা, সে তখন তার চেয়ে বড় ও বিশাল কোন অস্তিত্বের আশ্রয়ের সন্ধান খুঁজে পায়। তিনি জানেন এ বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিই একজন পরম পরাক্রমশালী ও বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তার অধীন। আর আমাদের পরিত্রানদাতাও তিনি। ফলে একজন আস্তিক ব্যক্তি এ ধরনের কঠিন ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মোকাবলা করার জন্যে যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

অপর দিকে একজন বস্তুবাদী ব্যক্তি এ ধরনের পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। হতাশা ও ভয় তাকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ফেলে একটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায়। এমতাবস্থায় সে নিরাশ্রিত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। আর এ কারনেই বস্তুবাদীরা এহেন তহাশাগস্থ অবস্থায় আত্মহত্যার

ঘৃন্য পথের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে আস্তিকবাদীরা সর্বাবস্থায় তাদের মহাপরাক্রমশালী পরিত্রানদাতার আশ্রয় কামনা করে থাকেন। আর এ কারনেই তারা কখনো আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারেন না।

আর এক ন্যায়সংগত কারণে ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা মহাপাপ বলে পরিগণিত। কেননা আত্মহত্যা হতাশা ও পরাজয়ের মনোভাব থেকেই জন্ম লাভ করে থাকে।

৮

আস্তিকবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ

কার্যকারণ

শৃঙ্খলীয় প্রমাণ

মানব প্রকৃতি ও সত্যান্বেষী স্বভাব

অস্তিত্ব বিভক্তির প্রমাণ

কার্যকারণ

নিঃসন্দেহে বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুই অপর কোন সত্তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। অন্য কথায় প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টির পেছনে নিশ্চয়ই কোন কার্যকারণ রয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যদি আমাদের বাড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে প্রত্যক্ষ করবো সুপরিকল্পিত সুন্দর একটি গৃহ। তখন যদি বলি এত সুন্দর একটি গৃহ নির্মাণের পেছনে কেউ কাজ করেনি, এমনিতেই আপন সত্তার বলে নির্মিত হয়েছে তা'হলে আমাদের বিবেক- বুদ্ধির ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করলে কি অমুলক কিছু হবে? আমাদের গৃহের যে কোন আসবাপত্রের কথাই ধরুন। গৃহাভ্যন্তরে সজ্জিত সুন্দর একখানা দেয়াল ঘড়ি, আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরী সোফা ইত্যাদির ব্যাপারে যদি কেউ বলে এত সব সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র স্বীয় সত্তা বলে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হয়েছে তাহলে আপনি তাকে নির্বোধ, বোকা ও বুদ্ধিহীন বললে কি কোন অন্যায় করবেন? সব বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে এ সব প্রতিটি বস্তুর জন্যে নিশ্চয়ই একজন প্রস্তুতকারক রয়েছেন। কেননা কোন কিছুই স্বীয় সত্তায় সৃষ্টি হয়নি। এ সৃষ্টিজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে নিঃসন্দেহে স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হবো যে, এতসব সুন্দর, মনোরম, নিখুত ও শৈল্পিক সৃষ্টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়ে যায় নি বরং এ সকল সৃষ্টির পেছনে নিশ্চয়ই কোন কার্যকারণ রয়েছে। এ জগতের পরমাণু থেকে বৃহৎ সৃষ্টি পর্যন্ত প্রতিটি সৃষ্টিই নিখুত এবং চমকপ্রদ। যদি কোথাও আমরা একটা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ছবি প্রত্যক্ষ করি তা'হলে আমাদের বিবেক, জ্ঞান ও অবচেতন মন নিঃসন্দেহে একজন ছবি অংকনকারীর কথা ব্যক্ত করতে বাধ্য হবে। আর সে ছবি ও চিত্র যদি আপনার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় ও মনোহরিণী আকার ধারণ করে তা'হলে নিশ্চয়ই আপনি বলবেন এর স্রষ্টাও একজন সুরুচিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ শিল্পী না হয়ে পারেন না। আপনি যখন একটা সুন্দর গ্রন্থ অবলোকন করেন তখন কি "এ পুস্তকের কোন গ্রন্থকার নেই" কথাটি ব্যক্ত করেন? নিশ্চয়ই না। কেননা কোন অস্তিত্বশীল সত্তার জন্যে প্রস্তুতকারকের অস্তিত্বহীনতার ধারণা পাগলের প্রলাপ মাত্র।

এ বিশ্বজগতে প্রতিটি সৃষ্টিই সুন্দর ও আকর্ষণীয়। বিস্তীর্ণ মহাকাশ সুপ্রশস্ত ভূ- পৃষ্ঠ, সুবিশাল নদ- নদী, পাহাড়- পর্বত, বিশাল গ্রহরাজী ও নক্ষত্র মন্ডলী, বিষ্ময়কর জীব- জন্তু, মনোরম বৃক্ষরাজী- বনভূমী ও সুন্দর তরুলতা সব কিছুই একটা নির্দিষ্ট কার্যকারণের মাধ্যমে সত্তাশীল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শহীদ ডঃ জাভেদ বাহোনারের বক্তব্য প্রানিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন, কার্যকারণ সন্বন্ধীয় বিধি- বিধান আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছনে একটা কারণ থাকে এবং কারণ ছাড়া কোন ঘটনাই ঘটতে পারে না। ...এবং বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার বিশাল অংশ এই দার্শনিক নীতির উপর ভিত্তিশীল। অধিকন্তু কারণ অনুসন্ধান মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। সে কারণে কোন চিত্রকর্ম, ভবন অথবা কারো পদচিহ্ন দেখেন কিংবা কোন আওয়াজ শুনতে পেলেই মানুষ তার বোধগম্যতার স্তর যাই হোক না কেন, ঐ সব ঘটনা সংঘঠনকারী কারণ বা মাধ্যমের অনুসন্ধান করে, যেন প্রতিটি ঘটনা সংঘটনের কারণ অনুসন্ধান তার পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য লিপি। এ জন্যেই মানুষ এই বিশ্ব জগতে সৃষ্টি ও এর সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে বিষ্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে যায়।[২]

আল্লাহ্ পাক আল্ কোরআনে বলছেন :

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)

অর্থাৎ : আমি (আল্লাহ্) অচিরেই তাদেরকে প্রান্ত স্থানসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাবো যেন তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে সেটা সুনিশ্চিত সত্য।(সূরা ফুসসিলাত, আঃ ৫৩)

শৃঙ্খলীয় প্রমাণ

সৃষ্টিজগতের সকল ক্ষেত্রে একটি সুষম বিন্যাস, শৃঙ্খলা, সমন্বয়, সামঞ্জস্যতা এবং ভারসাম্য বিদ্যমান। দিন- রাতের পালাবদল, সপ্তাহ মাস, ও বৎসরের সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্থ ব্যবস্থা, ঋতুসমুহের সঠিক নিয়ম ও পরিচালনা, সবকিছুই একটি নিশ্চিত ব্যপারে বিশ্বাস স্থাপন করতে সাহায্য করে যে, এ বিশ্বজগত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্রিয়াশীল।

সিসিল বাইক হাইম্যান (Cecil Boyce Hamann) নামক একজন বিজ্ঞানী তারকারাজীর ব্যাপারে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে : “যদি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে তারকারজীর শৃঙ্খলার বিস্ময়কর কার্যাদি পরিদর্শনে অবাক কণ্ঠে চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে আসবে। দিবা-রাত্রি, ঋতুর পালাবদল, শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে অস্তিত্বমান আসমানের রশ্মিগুলোসহ সবকিছু এক নির্দিষ্ট পথে ঘূর্ণায়মান। এরা এতই সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তাদের নিজ নিজ কক্ষে আবর্তিত হচ্ছে যে কয়েক শতাব্দি পূর্বে বর্তমান সময়ের সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় নির্ধারণ করা সম্ভব।”

এর পরও কি কেউ বলতে পারে যে, গ্রহ-নক্ষত্র কোন একটি দূর্ঘটনার ফলাফল, আর তারা নিজ কক্ষপথ ভুলে দিকবিদিক ছোটাছুটি করছে? যদি নক্ষত্ররাজীর কক্ষপথ অনির্দিষ্ট এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা বহির্ভূত হতো তা'হলে কিভাবে মানুষ মহাসমুদ্র, শুস্কমরুভূমি ও নাম-নিশান বিহীন পথঘাটগুলোতে তারকার ঘূর্ণাবর্তের মাধ্যমে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হতো? যারা মহাপরাক্রমশালী বিধাতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন তারাও এ ব্যপারে একমত যে, মহাকাশের রশ্মিসমূহের আবর্তন এক নির্দিষ্ট শক্তির অনুসরণ করে চলছে। তাই নক্ষত্রমণ্ডলী কখনও দূর্ঘটনাক্রমে আপন কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে শূন্যাকাশে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘূর্ণন করতে পারে না। এতসব শৃঙ্খলা ও বিন্যাস ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগ্রত হয়, কে এ সব কিছুর পরিচালক, নির্মাতা ও শৃঙ্খলাদানকারী? আমরা যদি কোন স্কুলের ব্যাপারে শুনি যে, ঐ স্কুলের ছেলে-মেয়েরা একটি নির্দিষ্ট রংয়ের পোশাক পরিধান করে স্কুলে আগমন করে এবং সঠিক নিয়ম-নীতি মেনে চলে আর সকলে খুব সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ, তারা সবাই শিক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে থাকে তা'হলে এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হবে না যে ঐ স্কুলে নিশ্চয়ই একজন নীতিবান ও বিজ্ঞ শিক্ষক ও পরিচালক রয়েছেন।

বিশ্বব্যবস্থার সকল দিকগুলো বিবেচনা করলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবো যে, এ বিশ্বের সকল কিছু শৃঙ্খলাধীন সুনিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি প্রত্যক্ষ করবে না কেউ। সবাই

আপন দায়িত্ব পালনে ত্রুটিহীন। স্বভাবতঃ- ই মনে প্রশ্ন জাগ্রত হয়, এতসব কিছুর একজন ব্যবস্থাপক ছাড়াই কি পরিচালিত হচ্ছে?

সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ হচ্ছে সূর্য। সূর্যের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে ৩, ৩০, ০০০ গুণ বড়। সৌরজগত হচ্ছে ছায়া পথের একটি অংশ। এতে অন্তঃত এক বিলিয়ন সূর্য আছে যার অধিকাংশই আমাদের সূর্যের ওজনের চেয়ে অনেক বেশী। জ্যোর্তিষবিদগণ বলেন, আমাদের ছায়াপথের ন্যায় একলক্ষ ছায়াপথ বিশ্বজগতে বিদ্যমান।

আবার ভূ- মণ্ডল বিশ্বজগতের এমন একটি গ্রহ যেখানে সর্বত্র ভারসাম্য বিরাজমান এবং এর নিজের চতূর্দিকে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়নমান। যার ফলে দিবা- রাত্রির উদ্ভব হয়েছে। তারপরও সূর্যের চতূদির্কে বাৎসরিক অবস্থান পরিবর্তন অব্যাহত রয়েছে। এ অবস্থান পরিবর্তনের কারণেই ভারসাম্য ও ভূমণ্ডলের কেন্দ্রীয় অবস্থান সর্বদা সংরক্ষিত রয়েছে। এ ধরনের সুবৃহৎ ও সুশৃঙ্খল সৃষ্টি ব্যবস্থা কি কোন মহাক্ষমতাবান প্রস্তুতকারকের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে না? হ্যাঁ তিনিই সর্বশক্তিমান মহাপরিচালক। তার সার্বভৌমতা ও শাসন ক্ষমতার পরিধির কোন সীমারেখা অংকন করা সম্ভব নয়। ইসলাম ধর্মে তিনিই 'আল্লাহ' নামে অভিহিত।

মানব- প্রকৃতি ও সত্যান্বেষী স্বভাব

এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের বিভিন্ন পথ রয়েছ। দার্শনিকগণ তাদের দর্শনের প্রমাণ করে থাকেন। আরেফ ও আধ্যাত্মি ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ প্রমাণাদিও আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এ সকল পথের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও সরল পথ- যা অতিক্রম করলে সহজে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব, তা হলো আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ। আমাদের প্রকৃতগত স্বভাব এমন একটি বিষয় যা ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। আরাবীতে এই স্বভাবজাত শব্দটি ফিত্রাত (فطرة) নামে পরিচিত এবং এর ইংরাজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Nature যা সর্বকালে, সর্বস্থানে ও সব মানুষের মাঝে সমানভাবে বিরাজমান। মা তার

সন্তানকে ভালবাসেন। নবজাত শিশুকে শিখিয়ে দিতে হয় না যে, এটি তোমার মা। তাই মায়ের প্রতি সন্তানের আকর্ষণ মানবীয় স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। তদ্রূপ স্রষ্টা অন্বেষণের মনোভাব প্রতিটি মানুষের একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার। প্রতিটি মানুষের অন্তঃকরন খোদা অন্বেষী। মানুষ কৌতুহলী মনোভাব নিয়ে ছুটে চলে এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে। এ কাজটি কাউকে শিখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয় না। মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে নিজেকে যে কোন এক মহাশক্তির অধীনে অবনত রাখতে ইচ্ছুক। আর স্বভাবতঃই এ ধরনেরই এক খোদা অন্বেষণী ঝংকার মনের একান্ত নিবিড়ে প্রতিটি স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষের অন্তকরণ থেকে বেজে উঠে।

সত্যান্বেষী আকাঙ্খা মানুষের সহজাত প্রকৃতিরই অন্তর্ভূক্ত। সাধারণভাবে কোন মানব হৃদয়ই এ অনুভূতি শূন্য নয়। প্রতিটি মানব মনই সর্বদা সকল বিষয়ের মূল উৎস উদঘাটন করতে বদ্ধপরিকর। জ্ঞান অন্বেষনের ব্যাপারে সে স্বভাবতঃই কৌতুহলী। প্রয়োজনে জ্ঞান পিপাসা মিটানোর জন্যে মানুষ যে কোন কষ্ট স্বীকার করে নিতেও কুন্ঠাবোধ করে না। আর এ কারনেই মানুষ তার আত্মপরিচিতির ব্যাপারে স্বীয় বিবেক প্রসূত যে সকল প্রশ্ন থাকে তাহলো, আমরা কোথা থেকে এসেছি? কি আমাদের দায়িত্ব? মানুষের মৌলিক ও স্বভাবজাত প্রসূত জিজ্ঞাসা। কেননা উপরোক্ত প্রশ্নগুলো তার স্বভাবজাত কৌতুহলী মনোভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। মনীষীগণ বলেন : বর্ণ, গোত্র, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে যদি তার স্বীয় অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয় আর যদি বিশেষ কোন মতবাদের শিক্ষা- দীক্ষা না পায় এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা- অভিপ্রায় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে তাহলে সে আভ্যন্তরীন তাড়না থেকেই নিঃসন্দেহে কোন মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন অনুভব করবে। এ ধরনের ব্যক্তি তার বিবেকের গভীরে এমন এক ধরনের সুপ্ত আওয়াজ অনুভব করে, যা তাকে এ বিশ্বজগতের সূচনাকারী মহান স্রষ্টার প্রতি অণুরাগী করে তোলে। ইসলামে এ ধরনের মহাশক্তির নাম হচ্ছে 'আল্লাহ্'। মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, প্রধানতঃ আল্লাহর উপাসনা স্বাধীনভাবে মানুষের সহজাত প্রকৃতি থেকেই উদ্ভব হয়েছে। এটা মানব প্রকৃতিরই দাবী। তাই, মানব সভ্যতার ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা দেখতে পাই মানুষ সর্বদা কোন না কোন শক্তির প্রতি নিজেকে সমর্পন করেছে এবং তাকে সৃষ্টিকর্তা বলে

পূজা- অর্চনা করেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায়, আল্লাহ্‌র উপাসনা- ইবাদত সর্বকালে, সর্বস্থানে বিভিন্ন রূপে মানুষের মাঝে বিরাজমান ছিল। আর মানুষের মাঝে এ একই ধরনের অনুভূতি ও মনোভাব যা তাকে সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি মুখাপেক্ষী করে রাখে তা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে এ বিষয়টা মানুষের স্বভাবপ্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। এ জন্যে অন্য কোন দার্শনিক প্রমানের প্রয়োজন হয় না মোটেও। প্রশ্ন হতে পারে খোদা অন্বেষণ মানব প্রকৃতির অংশ হলে পৃথিবীতে নাস্তিকতার অবস্থান বিদ্যমান কেন? হ্যাঁ, খোদা অন্বেষী মনোভাব মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। যদিও তা সবার মধ্যে সমপরিমাণ বিরাজমান নয়। কেননা, যারা বিভিন্ন রকমের শিক্ষা, প্রচার ও পরিবেশের শিকার তারা এ শিক্ষা, অপপ্রচার ও দূষিত পরিবেশের মাঝে বৃদ্ধিলাভ করেছে। তাই তাদের ফিত্রাত সে সব শিক্ষা ও প্রচারের মোটা কালো আবরণে ঢেকে গেছে। তাদের অন্তরচক্ষু থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে এমন একটি বাল্বের তুলনা করা যায় যা একটি মোটা কালো কাপড় দিয়ে পেচিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর সুইচ অন্ থাকার পরও সে বাল্ব আলো বিতরণ করতে পারছে না। কিন্তু যখনই এই অপপ্রচার ও অপসংস্কৃতির কালো পর্দা তাদের মন ও হৃদয় থেকে সরিয়ে নেয়া হবে তখনই তা একটি শক্তিশালী বাল্বের ন্যায় আলো বিকিরণ করতে সক্ষম হবে। তাদের বিবেকই তখন ব্যক্ত করবে - নিশ্চয়ই এ বিশ্ব জগতের কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

অস্তিত্ব বিভক্তির প্রমাণ

বুদ্ধিভিত্তিক দৃষ্টিকোন থেকে আমরা অস্তিত্বসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি। কেননা আমরা যখনই অস্তিত্বের প্রকারভেদ নিয়ে চিন্তা করি তখন সেটা হয় তার জাত সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হবে নতুবা অসম্পৃক্ত।

সুতরাং : যদি কোন অস্তিত্বের ধারণা করে তাকে তার জাতসত্তার সাথে সংযোগ করানো না যায় তাহলে এ ধরণের কোন সত্তা কখনো সত্তাশীল হতে পারে না। দর্শনের পরিভাষায় এটাকেই বলা হয় :

১. অসম্ভাব্য অস্তিত্ব (মুমতানেউল উজুদ) অপরদিকে যে অস্তিত্বকে তার জাতসত্তার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় সেটা আবার দু'ভাগে বিভক্ত।

যে অস্তিত্ব কখনো তার জাতসত্তা থেকে পৃথক হয়ে অনস্তিত্বে পরিণত হয়ে যেতে পারে সে সত্তার নাম দর্শনের পরিভাষায় বলা হয় :

২. নির্ভরশীল সম্ভাব্য সত্তা (মুমকিনুল উজুদ) এবং যে সত্তা কখনো তার জাত থেকে পৃথক হতে পারে না দর্শনের ভাষায় বলা হয় :

৩. স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী সত্তা (ওয়াজিবুল উজুদ) অতএব সত্তাশীল সকল অস্তিত্বকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) নির্ভরশীল সম্ভাব্য সত্তা

(২) স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী সত্তা

বস্তুজগতের সকল সত্তাই বস্তুগত নির্ভরশীল সম্ভাব্য সত্তা। নিম্নে বস্তুগত নির্ভরশীল সম্ভাব্য সত্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা গেল :

(ক) পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোগ, বিয়োগ .... ইত্যাদি।

(খ) অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব আসা আবার অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বে ফিরে যাওয়া।

(গ) এ ধরনের অস্তিত্বের জন্যে অস্তিত্বশীলতা ও অস্তিত্বহীনতা উভয়ই সমান। একটি অপরটির উপর কোন প্রকার প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। বরং এ দু'টির সম্ভাবনা সর্বদা সমানভাবে বিরাজমান।

(ঘ) অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব, অবশ্যই কোন নির্দিষ্ট কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল। কোন কারণ ছাড়া এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে না। আর স্বাধীন অবশ্যাম্ভাবী সত্তার বৈশিষ্ট্যাবলী যেমন : আদি অন্তহীনতা, সর্বদা বিরাজমান, সকল কারণের মূল কারণ, আদিসত্তা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক জগতের সবকিছুই কোন এক সময় সৃষ্টি হয় পরিশেষ আবার তা ধ্বংস হয়ে যায় অর্থাৎ সকল বস্তুগত সত্তা- ই কোন এক সময়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে আবার একটা নির্দিষ্ট সময়ে তা

অনস্তিত্বে প্রত্যাবর্তীত হয়ে যায়। মোট কথা সর্বদা পরিবর্তন ও রূপান্তরের আবরণে আবৃত থাকে বস্তুগত সত্তা। তাই এ সকল অস্তিত্ব হচ্ছে সম্ভাব্য নির্ভরশীল মুখাপেক্ষী সত্তা। সবটুকুই কোন নির্দিষ্ট কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল, স্ব- প্রচেষ্টায় বস্তুসত্তা অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না কখনো।
স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে তাহলে সৃষ্টিজগতের মূল কারণ কে? এর উত্তরে যদি বলা হয় এ সকল সৃষ্টির পেছনে কোন কার্যকারণ ছিল না তা'হলে উত্তরদাতা দর্শনশাস্ত্রের সে সুপ্রমাণিত নীতিরই বিরুদ্ধাচারণ করলেন, যেখানে বলা হয়েছে "সব ফলাফলের পেছনে একটি নির্দিষ্ট কার্যকারণ বিদ্যমান।" আবার যদি বলা হয় বস্তুনিচয়ের সৃষ্টির কারণ তারা নিজেরাই অর্থাৎ প্রকৃতি নিজেই তার সৃষ্টিকারক, তাহলে নিদারুণ সত্যেরই অবমাননা করা হবে। কেননা, বস্তু নিজের সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার রূপ ধারণ করতে পারে না কিছুতেই। এ ধরনের উত্তর আমাদের নিরেট বুদ্ধিবৃত্তির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না মোটেও। কি করে অনস্তিত্ব, অস্তিত্বের প্রবর্তক হতে পারে? আবার যদি বলা হয় সৃষ্টি বস্তুর স্রষ্টা অপর কোন বস্তুগত সত্তা তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়, তার সৃষ্টিকর্তা কে? কেননা সকল বস্তুগত সত্তাই অন্য কোন সত্তার বলে সৃষ্টি হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যদি অপর কোন সম্ভাব্য নির্ভরশীল বস্তুগতসত্তার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয় তাহলে এ ধরনের প্রশ্ন অবিরাম চলতেই থাকেব। আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ অসমাপ্ত চেইনটির এরূপ অবস্থান মেনে নিতে পারেন না। কারণ, যদি কোথাও গিয়ে এর প্রশ্ন শেষ না হয় তা'হলে বস্তুজগতের অস্তিত্ব ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে।
অতএব, নিঃসংকোচে আমাদের এমন এক সত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যিনি সকল সৃষ্টির পূবেই অস্তিত্বমান, যার মাধ্যমে কার্যকারণের অসমাপ্ত চেইনের হবে পূর্ণতা লাভ। যিনি সর্বপ্রথম, আদিসত্তা, শাশ্বত। তিনি হলেন অপরিহার্য সত্তা। তিনি আপন থেকেই অস্তিত্বমান ও আবির্ভূত যার কোন সূচনা নেই, সূচনা তারই সৃষ্টি।

৯

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার পরিচয়

বিজ্ঞান ঈমানের অগ্রদুত।

মানুষের জ্ঞান স্বল্প ও সীমিত।

আল্লাহর অস্তিত্ব বিজ্ঞানের পথধারার উর্দ্ধে।

বিশ্ব- প্রকৃতির সূচনাকাল বিদ্যমান।

প্রাকৃতিক বিশ্বে নিয়ম- শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত।

উদ্ভিদ জগতে শৃঙ্খলা।

এটোমের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা।

অতি ক্ষুদ্রতম অণু কোষের ভিতর শৃঙ্খলা।

মৌলিক পদার্থের ছকে যথার্থ হিসেব ও শৃঙ্খলা।

নভোপুঞ্জ এবং পৃথিবীর কল্পনাতীত বিশালতা।

কয়েকটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

দুর্ঘটনা নাকি কোন মহাশক্তির পরিচালনা?

বিজ্ঞান ঈমানের অগ্রদূত

"বিশ্ব–শ্রেষ্ট পদার্থবিদদের মধ্যে 'লর্ড কেলওয়াই' অন্যতম। তিনি বলেন : যদি আপনি উত্তম রূপে চিন্তা–ভাবনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন,বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নে বাধ্য করছে"।[৩]

পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানী ও গবেষকদের অনেকেই তাদের গবেষণার এক পর্যায়ে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের সামনে আত্মসর্মপণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এমনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হলেন আমেরিকান 'ম্যাক্স প্লাংক'- যিনি এটোমের আভ্যন্তরীন গুপ্ত রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেছেন : "ধর্ম ও প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্মিলিতভাবে নাস্তিকতা, কুসংস্কার ও সন্দেহ প্রবণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এগুলোর (ধর্ম ও প্রকৃতি বিজ্ঞান) উত্থানের পেছনে সর্বদা আল্লাহর শক্তিমত্তা ক্রিয়াশীল ছিল।"[৪]

"Albert Me combs Winchester" নামক একজন জীব বিজ্ঞানী বলেনঃ "বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে দেয়, যার ফলে মানুষ ভালভাবে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়। সাথে সাথে তার শক্তিমত্তা, মহত্ত্ব ও সৃষ্টিক্ষমতা সম্পর্কেও অধিক ওয়াকিবহাল হতে পারে। বিশ্বের প্রতিটি নব্য আবিস্কার মানুষের ঈমানের দৃঢ়তা শতগুণ বৃদ্ধি করে দেয়। আর সেই সাথে তা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা- চেতনাতে বদ্ধমূল সকল প্রকার কুমন্ত্রণা ও শেবেকর মূলৎপাটনে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। অতঃপর তদস্থলে তাওহীদ ও আল্লাহর পরিচয়ের উন্নত চিন্তা ও আকিদা স্থাপন করে দেয়।"[৫]

Edwad Luter Kessel নামক এক প্রাণী বিশেষজ্ঞ বলেন : "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীগণ তাদের জ্ঞানগর্ভ প্রমাণাদি কে যেমনিভাবে বৈজ্ঞানিক ফলাফল অর্জনের জন্যে অধ্যয়ন করে থাকেন তেমনি যদি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ কল্পে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করতেন তা'হলে অবশ্যই তারা একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বীকার বাধ্য হতেন।"

এ কাজে স্বভাবতঃই সকল ধরনের গোড়ামী পরিহার করে চলতে হবে। সকল প্রকার জ্ঞান- গর্ভ আলোচনা ও অধ্যয়ন একজন সুস্থ বিবেকবান ব্যক্তিকে সৃষ্টির একক ও প্রথম কারণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে, যাকে আমরা আল্লাহ্ বলে সম্মোধন করে থাকি।

অতঃপর তিনি বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের আবিস্কার সমুহকে মানব- জাতির জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ রহমত ও দান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরো বলেন : "আল্লাহর এ অসংখ্য নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা তখনি সার্থকতার রূপ ধারণ করবে যখন মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমানের দৃঢ়তাকে আরো অধিক বাড়িয়ে দিবে''।

মানুষের জ্ঞান স্বল্প ও সীমিত

"সাধারণতঃ মানব সমজে প্রচারিত অধিকাংশ ধারণাই ভুল ও গোমরাহীতে ভরপুর থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অধিকাংশ মানুষ মনে করে থাকে, বিজ্ঞান একজন অভিজ্ঞ জ্ঞানী ও বাগ্মীর ন্যায় সকল প্রকার সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটি কিন্তু এর সম্পূর্ন বিপরীত। মুলতঃ বিজ্ঞান ঠিক একজন যুবকের ন্যায় বিভিন্ন ধরনের সমসায়িক প্রশ্ন ও সমস্যার উত্তর ও সামাধান দেয়ার চেষ্টা করে থাকে। এমন কোন বিজ্ঞানী খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি তার অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন। কেননা, তারা জানেন, তাদের অর্জিত জ্ঞানের চেয়ে অজানা বিষয়ের সংখ্যা অনেক বেশী।" - উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন পদার্থ ও গণিত বিজ্ঞানী জনাব Earl Chester Rex। প্রকৃতপক্ষে পদার্থ বিদ্যায় ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব যেগুলোর প্রথমে' কিভাবে (How(শব্দটি অবস্থিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'কেন' (Why) শব্দের ভিত্তিতে প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর দিতে পারে না পদার্থবিদ্যা।

উদাহরণস্বরূপ : কিভাবে দু'টি বস্তু পরস্পর আকর্ষিত হয়ে? - এ প্রশ্নে উত্তর নিউটনের মধ্যাকর্ষণ সুত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে দিয়েছ। কিন্তু কোন দুটি বস্তু পরস্পর আকর্ষিত হয়? - এর জবাব এখনও কোন বিজ্ঞানী দিতে সক্ষম হয়নি। এমনও বহু প্রশ্ন আছে যা 'কিভাবে' শব্দ দিয়ে শুরু করলেও সেগুলোর উত্তরে মধ্যে 'হয়তো', 'সম্ভবতঃ' শব্দদ্বয় যুক্ত করা হয়। আমরা জানি, মধ্যাকর্ষণ

শক্তির কারণে আমরা ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুমন্ডলের চাপের মঝেও নিজেদের ভারসাম্য বজায় রেখে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারি। আমরা আরো জানি, পৃথিবী তার নিজকক্ষে সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে, কিন্তু কেন এমন সব ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে? এসবের উত্তর বিজ্ঞানীরা অনুমানের উপর ভিত্তি করে দিয়ে থাকেন।

এ বিশ্ব-প্রকৃতির একটি সুত্র হলো : ''যদি দু'টি বস্তুর মাঝে অত্যাধিক দুরত্ব বিদ্যমান থাকে তাহলে তারা পরস্পর বিকর্ষিত হবে। কিন্তু কেন? এর কোন উত্তর অদ্যবধি কোন বিজ্ঞানী দিতে পারেন নি।

প্রকৃত সত্য এই যে, মানবজাতি তার উজ্জল বৃদ্ধিমত্তা ও বিশাল পান্ডিত্য দ্বারা এখনও সে নিজেকেই পরিপূর্ণভাবে চিনতে পারেনি। ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ, চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাদের জ্ঞান ও উপলদ্ধি ক্ষমতা অত্যন্ত স্বল্প ও সীমিত। সাধারণ মানুষের মত চিন্তাবিদগনও বিশ্বাস করেন যে, বিশ্ব জগতে এমন অনেক জিনিষ আছে যা এখনও মানুষ উপলদ্ধি করতে সক্ষম হয়নি। যেমন ধরুন, রুহের ব্যাপারে কোন বিজ্ঞানী, কি ব্যাখ্যা দিতে পারেন? রুহ্ হচ্ছে মানব জীবনের একমাত্র চালিকা শক্তি। আর রুহ্-ই ঐ সব অজানা বস্তুর অন্যতম। বিজ্ঞান সফলতার সাথে পরমাণুর সুক্ষ্মতিসূক্ষ্ম ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সৃষ্ট বস্তুসমুহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রদান করতে পারলেও মানুষের রুহ্ ও বিবেক বুদ্ধির সংজ্ঞা দিতে একেবারেই অপারগ। বিজ্ঞানীরা ভাল করেই জানেন যে, তারা বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে পর্যালোচনা ও গবেষাণা করতে পারেন, কিন্তু বস্তুনিচয়ের অস্তিত্বও তাদের বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত কারণ উদঘাটন ও বর্ণনা করতে পারবেন না। বিজ্ঞান অনেক কিছুরই সংজ্ঞা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে যেমন : 'বিশ্বাস', 'সৌন্দর্য', 'আনন্দ' ইত্যাদি।

অস্বীকার করার জো নেই যে, বস্তু সম্পর্কে সব ধরনের জ্ঞান আমাদের নেই। এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান ভাসমান তৃনের মত। পরমাণুর জগতে যা কিছু অত্যন্ত জটিল ও বিশৃঙ্খল বলে মনে করে

থাকি বস্তুতঃ তার কোন অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। আর সম্ভবতঃ এ ধরনের ভুল নির্দেশনা আমাদের ত্রুটিময় জ্ঞান ও পর্যাপ্ত পর্যালোচনা- গবেষণার অভাব থেকেই নিঃসৃত হয়ে থাকে।

আল্লাহর অস্তিত্ব বিজ্ঞানের পথ ধারার উর্দ্ধে

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ- গবেষণার দ্বার উম্মুক্ত করা হয়নি। বরং বিজ্ঞানের কাজই হলো এ বিশ্ব- প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো। বিজ্ঞানের আবিস্কার ও নতুন কোন সুত্রের সাথে সর্বপ্রথম বা আদি সত্তার অস্তিত্বের পর্যালোচনার কোন সম্পর্ক নেই। অন্য কথায় বিজ্ঞান মেশিন তুল্য একটি যন্ত্রের ন্যায় প্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা- গবেষণা করে থাকে মাত্র, প্রকৃত ও আদি প্রস্তুত কারকের ব্যাপারে কোন আলোচনাই উপস্থাপন করে না। আল্লাহ্ এমন কোন বস্তুগত সত্তা নন যে তাকে কোন বিজ্ঞানাগারে রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো যেতে পারে। বরং তিনি হলেন পার্থিব জগতের উর্দ্ধে অবস্তুগত একটি সত্তা। বিজ্ঞানের সাহায্যে 'আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের বিষয়টি প্রেম ও সৌন্দর্যের ন্যায় অপার্থিব ও অবস্তুগত বিষয়গুলোর উপর ব্যর্থ গবেষণারই নামান্তর।

"মানবতার প্রীতিপূর্ণ মনোভাবের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে প্রেম। বিজ্ঞান এর কোন সংজ্ঞা দিতে পারেনি। কিন্তু কেউ কি প্রেম ও তদ্রূপ অন্যান্য অপার্থিব বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার দুঃসাহস রাখে? আর আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণও অভৌতিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনাবলী আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মাত্র, কিন্তু বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক কোন বক্তব্যই পেশ করে না।" - বলেছেল 'মারলিন বুক্স ক্রেইডার' (Marlin Books Kreider) নামক ফিজিওলজির একজন বিজ্ঞানী।[৬]

'আল্লাহ্ অস্তিত্বমান কি অনস্তিত্বমান' - এ বিষয়টি কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বৈষয়ীক অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ কল্পে এ বিষয়টির উপর উপর্যপরি গবেষণা চলছে, তবুও এতসব

প্রগাঢ় গবেষণা ও পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী কোন বস্তুগত প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। বস্তুতঃ প্রকৃতি কখনো তার ঊদ্ধ জগতের কোন সংবাদ প্রদান করতে পারেনা, যেমনিভাবে একটি অবরুদ্ধ দ্বার ও জানালা দিয়ে বর্হিঃজগত সম্পর্কে কোন খবরাখবর রাখা সম্ভব নয়। যেহেতু আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে কোন পার্থিব ও বস্তুগত উপায় উপকরণের মাধ্যমে অপারগতায় পর্যবসিত হয়েছে তাই সর্বদা এ ব্যাপারে আমাদের বিবেক প্রসূত জ্ঞান বিদ্যাকেই ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়ে আসছে।

এ সম্পর্কে (George Earl Davis) নামক একজন পদার্থবিদ বলেন, "আল্লাহর অস্তিত্বকে সরাসরি বিজ্ঞানের বিভিন্ন সুত্রে ফেলে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা সম্ভব নয়। কেননা, আমরা জানি আল্লাহ্ কোন বস্তুগতসত্তা নন। তিনি সকল পার্থিব ও বস্তুগত সীমানার ঊর্দ্ধে। তাই মানুষের সীমিত জ্ঞান- বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে কোন সংজ্ঞা দিতে পারে না"।[৭]

উপরোল্লেখিত বিজ্ঞানীদের অভিমত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞানের গবেষণার মূল বিষয় বস্তু হলো বস্তুর বৈশিষ্ট্য। এর কর্ম- ধারা হলো পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বস্তুসত্তাকে বিশ্লেষণ করা। আর এ কারণেই কোন অবস্তুগত সত্তা বিজ্ঞানের গবেষণার আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। যেহেতু মহান সৃষ্টিকর্তা ব্যতিক্রম ও প্রকৃতি বহির্ভূত একটি সত্তা, তাই কখনো এ ধরনের জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিমন্ডলের আওতাভুক্ত হতে পারেনা।

অতএব, যে বিদ্যা এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতে পারে তাহলো দর্শন (Philosophy) । কেননা দর্শন শাস্ত্রের আঙ্গিনা বিভিন্ন অকাট্য দলীল ও বিশুদ্ধ চিন্তা বুদ্ধি দ্বারা সুসজ্জিত। এ বিদ্যার আলোচনার বিষয় বস্তু হলো পার্থিব শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন সত্তা। সুতরাং যখন বলা হয় আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা বিজ্ঞানের বহিভর্তূ বিষয় তখন তার উদ্দেশ্য হলো :

এক : আল্লাহ্ একটি অবস্তুগত সত্তা। তার সত্তাকে কোন ইন্দ্রিয়গত মাধ্যমে বা পরীক্ষা- নিরীক্ষা বা অভিজ্ঞতার আলোকে নির্ণয় করা যায় না।

দুই : আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সরাসরী পর্যালোচনা ও গবেষণা বিজ্ঞানের পরীক্ষা- নিরীক্ষার পন্থায় সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে বিজ্ঞান যে এক প্রকার অবদান রাখতে পারে তার বিবরণ আমাদের পরবর্তী আলোচনায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এখন, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে বিজ্ঞানের প্রভাবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন অনুভব করছি। এ বিষয়ে বিজ্ঞানের অবদানকে আমরা দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

এক : বিশ্ব- প্রকৃতির সূচনা কাল।

দুই : বস্তু জগতে বিরাজমান নিয়ম- শৃঙ্খলা।

যখন বিজ্ঞানের অনুসন্ধানমুখী কর্ম- ক্রিয়া উপরোক্ত দু'টি বিষয় প্রমাণ করতে সক্ষম হবে তখন প্রকৃত পক্ষে অকাট্য প্রমাণসূত্র 'কিয়াস'*[৮] - এর গৌণ বাক্যটি প্রমাণিত হবে মাত্র। আর নির্ভুল ও সর্বজন স্বীকৃত মুখ্য বাক্যটির (উদাহরণ স্বরূপ, প্রতিটি শৃঙ্খলা ব্যবস্থার জন্যে একজন শৃঙ্খলা বিধানকারী প্রয়োজন, অথবা যে বস্তুর সূচনাকাল আছে তার সূচনাকারী নিশ্চয়ই বর্তমান) সমন্বয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ সুদৃঢ় হবে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুটি বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদের দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছি।

বিশ্ব- প্রকৃতির সূচনাকাল বিদ্যমান

''বিশ্ব প্রকৃতির সূচনাকাল বিদ্যমান'' বাক্যটি থেকে আমাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও জড়বস্তুর সৃষ্টি বোঝানো। কেননা, এ বিশ্বের সৃষ্টি ও তার নশ্বরতার ব্যাপারে শুধু আস্তিকবাদীরাই নন, জড় ও বস্তুবাদীরাও কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিমত পোষণ করেন না। উক্ত বাক্যটি থেকে সেই মৌলিক ও আদিম সত্তাকে বোঝানো আমাদের উদ্দেশ্য, যা এ বিশ্ব প্রকৃতির প্রধান ও প্রথম উপাদান হিসেবে পরিগণিত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীগণ প্রকৃতিকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও সূচনাকারী বলে বিশ্বাস করেন। তারা এ প্রকৃতির আদিম উপাদানকে সনাতন বলে দাবী করেন।

Oli Carroll Karkalits নামক রসায়ন শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞানী বাস্তবাদীদের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এভাবে, 'তারা বলেন, যদিও পৃথিবী ও সূর্য গ্রহের বয়স সীমিত এবং সুনির্দিষ্ট, তদুপরি সৃষ্টিজগতে বস্তু সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী উপাদানগুলো চীরবর্তমান। প্রাণী জগত জড় উপাদান থেকে পূর্ণাঙ্গতার সিঁড়ি বেয়ে পর্যায়ক্রমে সক্রিয় হয়েছে। আর তারই এক পর্যায়ে মানবজাতির সৃষ্টি'। অতঃপর, তাদের উপরোক্ত বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেছেন, এ বিশ্ব প্রকৃতির উৎপত্তি ও সূচনাকাল সম্পর্কে তাদের বক্তব্য সন্তোষজনক নয়। আমাদের নিকট এমন প্রচুর অকাট্য ও পরীক্ষিত দলীল প্রমাণাদি সংরক্ষিত আছে। যা থেকে অতি সহজেই প্রমাণ হয় যে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিকাল আছে, এ পৃথিবীর কার্যক্রম ও যাত্রা কোন একটি স্থান থেকে আরম্ভ হয়েছে। ট্যারমোডিনামিক (তাপ ও শক্তি) সূত্রও বিশ্ব জগতের আদিকাল নির্ণয় করে দেখিয়েছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাটিও উক্ত সূত্রের সমর্থন করে। সূত্রটি আরো বলে 'বিশ্বের এনট্রাপি শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে'। আর এ কথার অর্থ এই দাড়ায় যে, কোন কালে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর তাপমাত্রা সমপর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এ বক্তব্যটি তখনি সঠিক বলে প্রমাণিত হবে যখন অতীত ও সমসাময়িক সকল বস্তুর সদৃশ আকার ধারণ করবে। আর নিঃসন্দেহে সত্য যে, বস্তুর তাপমাত্রাও সমকক্ষ নয়। হয়তোবা পৃথিবীর সকল বস্তুর তাপমাত্রা কখনো সদৃশতায় পৌঁছাবে না। কেননা, বস্তুসমূহের তাপমাত্রা যতই পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকবে ততই তাদের চালিকাশক্তি ক্ষয়লাভ হতে থাকবে। তথাপি এ ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক ফলাফলকে কোন অংশে হেয় প্রতিপন্ন করে না। কেননা, যদি বস্তু ও শক্তি অনন্ত ও শ্বাশত অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করতো, আর বিশ্ব প্রকৃতির কোন আদি উদ্ভব- ই না থাকতো তা'হলে সময়গণক (এ্যানট্রোপি) সত্য ও সঠিক বলে প্রমাণিত হতো না কখনো।[৭]

Frank Allen হলেন একই সাথে পদার্থ ও জীব বিজ্ঞানী। তিনিও বিশ্ব প্রকৃতির আদি অন্ত প্রমাণ এবং এর শ্বাশত ও চিরন্তন অস্তিত্বের মতামতকে খণ্ডন করে বলেছেন :

'বিশ্ব সম্পর্কে চিরন্তন অথবা সৃষ্টি বস্তু হওয়ার ধারণা উভয়েই একটি ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হতে বাধ্য। আর তা হলো কোন একটি শক্তি অথবা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা সর্বদা অস্তিত্বমান। তবে দ্বিতীয়

টারমোডিনামিক সূত্র প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পৃথিবী সর্বদা গতিশীল, সেখানে সমস্ত বস্তু কোন এক সময়ে সমান সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পৌঁছে যাবে। তখন সকল শক্তি অকেজো হয়ে পড়বে এবং জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে উঠবে। যদি বিশ্ব সূচনাহীন অস্তিত্ব হতো তা হলে বহু পূর্বেই এর মৃত্যু ও স্থবিরতা আগমন করতো। উত্তপ্ত গোলাকার সূর্য, উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ এবং প্রাণময় ভূপৃষ্ঠ এ সকল কিছুই একটি একক সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ বিশ্ব সৃষ্টির সূচনাকাল বিদ্যমান এবং কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে তা সৃষ্টি ও যাত্রা শুরু করেছে। অতএব, এ বিশ্ব জগত সৃষ্ট বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না'।[১০]

এতক্ষনে যেহেতু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা সুপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, বিশ্ব প্রকৃতির আদি উৎপত্তি ও সূচনাকাল বিদ্যমান, তাই নিশ্চিত করে বলা যায় যে, স্বাভাবিকভাবে এর সৃষ্টির পিছনে একজন সৃষ্টিকারক কার্যকর রয়েছেন। আর জনাব ফ্রাঙ্ক এ্যালেনের স্বগোক্তি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

'সর্ব প্রথম ও সর্ববৃহৎ একটি কার্যকারণ অথবা একজন চিরঞ্জীব সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিরূপায় হয়েই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, যিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং সর্ববিষয়ে সংবিদিত। কেননা, তা না হলে বলতে হবে যে, এ বস্তুগত সত্তা (বিশ্ব) ও তার শক্তিমত্তাসহ সকল কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের রূপ ধারণ করেছে। এ ধরণের ধারণা এতই অর্থহীন ও অমূলক যে এব্যাপারে কোন প্রকার আলোচনা ও পর্যালোচনা সময় ও শ্রমের অপব্যয় বৈ কিছু নয়'।

পদার্থবিদ Edwin Fast: বলেন : 'পারমানবিক দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান বিশ্বের সূচনা লগ্নের অনুসন্ধান করতে গিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রকৃতির সমস্ত উপাদান এবং তাদের মধ্যকার সম্পৃক্ততা, মূল ও কেন্দ্রীয় অণূসমূহের প্রতিক্রিয়ার ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অবশেষে বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রোটন ও তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের সম্মিলনের কারণে পৃথিবীর সকল বস্তু উপাদান সৃষ্টি হয়েছে'।

তবে প্রশ্ন হলো, 'এ প্রোটন কোথা থেকে এসেছে? আর তার এ সকল বৈশিষ্ট্যেরই বা কারণ কি?' এ সকল প্রশ্নের উত্তর আজ অবধি কোন পদার্থবিদ দিতে পারেন নি। এ বিশ্ব প্রকৃতিতে

সামান্য একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবো যে, এ বিশ্বজগতের জন্যে নিশ্চয়ই একজন অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের আইন প্রণেতা বিদ্যমান, যিনি প্রকৃতির জন্যে কতক সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল বিধি-বিধান ও আইন-শৃঙ্খলা নির্ধারণ করেছেন এবং সৃষ্টির শুরুতে ইলেকট্রন, নিউটন ও প্রোটনগুলোকে এক বিশেষ গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করেছেন, যা থেকে প্রকৃতির সকল নিয়ম-নীতি উৎসারিত হয়েছে। যদি আমাদের সীমিত চিন্তা-ধারাকে শূন্য পয়েন্ট থেকে আরো একটু পিছনে নিয়ে যাই, তাহলে খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারবো যে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্যে নিশ্চয়ই এমন একটি আদি পয়েন্ট (Start Point) থাকা দরকার যার মাধ্যমে মূল অণু অথবা প্রকৃতির প্রাথমিক উপাদানগুলো অস্তিত্বমান হয়েছে। এটাই যুক্তিযুক্ত ধারণা যে, যে শক্তি এ সকল অণু-পরমাণু সৃষ্টি এবং সেগুলোকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত করেছে, তাকে অবশ্যই এগুলোরও পূর্বে অস্তিত্বমান থাকতে হবে। আর বস্তুনিষ্ঠ সত্য কথা হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা বহু শতাব্দী ধরে এ সকল অণু-পরমাণুর আবিষ্কার ও উদঘাটনে অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আসছেন আর আজ তাদেরই অনেকে সেই প্রথম পরমাণুর একক স্রষ্টাকে জানার জন্যে সর্বাত্তক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।[১১]

রসায়ন ও গণিতবিদ John Cleveland Cithara বলেন, ‘রসায়ন শাস্ত্রে এটা সুপ্রমাণিত যে বস্তু কোন এক সময় ধ্বংস হবেই। তবে বস্তুর কিছু উপাদান অত্যন্ত ধীর গতীতে আর অবশিষ্ট বস্তু তড়িৎ গতীতে ধ্বংসের দিকে ধাবমান। অতএব বস্তুর অস্তিত্ব শ্বাশত নয়, সৃষ্টি বস্তুর জন্যে অবশ্যই সূচনাকাল বিদ্যমান’।[১২]

প্রাকৃতিক বিশ্বে নিয়ম- শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত

এখন আপনাদের সমক্ষে বিশ্ব প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল বিধি- বিধানের উপর এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়স্পর্শী আলোচনার সুত্রপাত করবো, যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিন্তাবিদদের মতামতে সমৃদ্ধ।

উদ্ভিদ জগতে শৃঙ্খলা :

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উদ্ভিদের বপন বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে নিহিত কারণসমূহে ব্যাপারে একজন উদ্ভিদ ও ভূমিবিদের মতামত পেশ করছি।

Lester John Zimmerman নামক একজন উদ্ভিদ ও ভূমিবিদ বলেন : 'উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান বায়ু ও মাটি থেকে নেয়া হয়ে থাকে। তবে একটা প্রশ্ন এখানে থেকে যায়, মাটির উৎপত্তি কোত্থকে এবং কেমন করে মৃত্তিকা উদ্ভিদের খাদ্য উপাদান সঞ্চয় করে রাখে? উর্বর মাটি খনিজ উপাদান থেকে গঠিত এবং সে মাটি যথেষ্ট পরিমাণ কার্বন ধারণ করে রাখতে সক্ষম। যা আদিম বৃক্ষ ও প্রাণীদেহের ধ্বংসাবশেষ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। পানি, বায়ু, আলো ও রাসায়নিক উপাদানগুলো যদিওবা উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক তথাপি এগুলোর কোনটাই একাজের জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং এক অদৃশ্য শক্তি এসব সূক্ষ্ম ও জটিল কাজে কার্যকর, যা প্রতিটি বীজের অভ্যন্তরে লুকায়িত। সেই শক্তিই একটি উপযোগী পরিবেশে একটি বৃক্ষের বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক সহযোগীতা করে থাকে। এ শক্তির সময়োপযগী পরিবেশে একটি বৃক্ষের বৃদ্ধিতে সর্বাত্তক সহযোগীতা করে থাকে। এ শক্তির সময়োপযগী পদক্ষেপ অত্যন্ত সূক্ষ্মতা ও নিপুণতার সাথে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রথমে বিভিন্ন কাজে পারদর্শী উপাদানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ডিম্বানুর সূক্ষ্ম দুটি কোষ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ শুরু করে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলো পৃথক পৃথকভাবে বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। যে বীজ মাটিতে ফেলা হয়ে থাকে পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে হুবহু সে বৃক্ষেরই রূপ ধারণ করে থাকে। গমের বীজ থেকে গম গাছই

উৎপন্ন হয়ে থাকে। যদি ওক বীজ বপন করা হয় তাহলে পরিণতিতে ওক বৃক্ষই পাওয়া যাবে। যদি কেউ স্বচ্ছ ধারণা ও নিরপেক্ষ অন্তঃকরণ নিয়ে এ ধরণের ক্রিয়া- কর্ম এবং বীজের বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে এ বিশ্ব জগতে বিরাজমান সৌন্দর্য ও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম- শৃঙ্খলার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করতে বাধ্য হবে'।[১৩]

এটোমের অভ্যন্তরে নিয়ম- শৃঙ্খলা :

জনাব কুরেন বলেন, নিঃসংকোচে বলা যায়, বস্তুজগত এক নিয়ম- শৃঙ্খলা ও আইন- কানুনের জগত, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার জগত নয়। এটা এমন এক জগত যেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের অনুসরণ করা হয়ে থাকে। দুর্ঘটনার পথ এখানে অবরুদ্ধ।

অতঃপর তিনি এটোমের দেহে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাপারে এরূপ বলেন, ''প্রতিটি এটোম তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

এক : প্রোটন (পজেটিভ),

দুই : ইলেকট্রন (নেগেটিভ),

তিন : নিউট্রন (পজেটিভ ও নেগেটিভের সংমিশ্রণ বা নিউট্রাল)

প্রতিটি এটোমের সকল প্রোটন তার কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত। ইলেকট্রন সংখ্যার প্রোটনের সমপর্যায়ে অবস্থিত। তারা সকলে কেন্দ্র বিন্দুর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ এবং বিভিন্ন কক্ষপথে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে থাকে। তাদের সাথে কেন্দ্র বিন্দুর দূরত্ব এতই অধিক যে একজন মানুষ এ ধরণের দূরত্ব অবলোকন করে এটোমের সাথে সৌরজগতের তুলনা দিয়ে বসতে পারে। সৌরজগতের ন্যায় এটোমের আকারও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শূন্যাকাশে আবৃত থাকে। উল্লেখ্য যে, এটোমের একটি উপাদানের সাথে অন্য আরেক উপাদানের পার্থক্য শুধুমাত্র সংখ্যাগত দিক দিয়ে কেন্দ্র বিন্দুতে প্রোটন আর কেন্দ্রবিন্দুর চতুর্দিকে ইলেকট্রন ও নিউট্রনের পার্থক্য এবং অবস্থানের ভিন্নতার সমতুল্য। অতএব, কোটি কোটি মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ অবশেষে এই তিন প্রকার বৈদ্যুতিক

অণু থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যা প্রকৃতপক্ষে একটি বস্তুর তিনটি রূপ। সেই বস্তুটির নাম বৈদ্যুতিক শক্তি বা Electricity আর এটাও এক অদৃশ্য শক্তির বহিঃপ্রকাশ''।[১৪]

অতি ক্ষুদ্রতম অণু কোষের ভিতর শৃঙ্খলা :

যদি আমরা এক ফোটা পানি পরীক্ষাগারের একটা নির্দিষ্ট কাচের উপর রেখে লক্ষ্য করি তাহলে প্রকৃতির এক অত্যাশ্চর্য প্রাণীর নড়াচড়া প্রত্যক্ষ করতে পারবো। এর ভিতর অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাবে যাকে Amibe ধীরে ধীরে হজম করে ফেলে। ফলে শুধুমাত্র ঐ ক্ষুদ্র প্রাণীর মলমূত্র অবশিষ্ট রয়ে যায়। যদি আমরা অধিক সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে প্রত্যক্ষ করবো যে Amibe নিজেকে লম্বা করে দুটি অংশে বিভক্ত করে ফেলেছে। যার ফলে দুটি যুবক ও শিশু Amibe এর উৎপত্তি ঘটে। এ ক্ষেত্রে আমরা একটি কোষকে দেখতে পাব যে বেঁচে থাকার জন্যে সে সব ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছে। অন্যদিকে এসব ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে বৃহদাকার প্রাণীরা পর্যন্ত বহু সহস্র কোষের প্রয়োজন অনুভব করে থাকে। শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বহু সহস্র মিলিয়ন কোষেরও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে এ ধরণের ক্ষুদ্র প্রাণীর জন্মদাতা কোন দুর্ঘটনা নয়। বরং সর্বপ্রকার ঘটনা প্রবাহের উর্দ্ধের কোন শক্তিই এ অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বিস্ময়কর প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা'। বিষয়টি বলেছেন, জীব বিজ্ঞানী Cecil Boyce Hamam। তিনি প্রাণীদেহের অভ্যন্তরে ক্রিমি জাতীয় জীবাণুর বিভিন্ন ভাগে বিভক্ততে বিশেষজ্ঞ এবং তারিশিন নামক এক প্রকার জীবাণু থেকে বিভিন্ন রোগের বিষাক্ত গ্যাস নির্ণায়ক।[১৫]

মৌলিক পদার্থের ছকে যথার্থ হিসেব ও শৃঙ্খলা :

মৌলিক পদার্থের চক্রাকার ছক এবং ব্যবস্থা, এমন এক বিধি ব্যবস্থার সুন্দরতম চিত্র যা এ বিশ্বের জন্যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ ছকটি এমন পদ্ধতিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে যে, বিশেষ ও সমগুণসম্পন্ন উপাদানগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে ঐ ছকের চতুর্দিকে সর্বদা ঘূর্ণয়মান থাকে। এ

চক্রাকার ছকে সমস্ত উপাদানগুলো ইলেকট্রোন সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে সন্নিবেশিত করা হয়ছে। ইলেকট্রোন সংখ্যা তার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রোটনের সংখ্যার সমতুল্য। এভাবে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি প্রোটন, দু'টি হেলয়ুম এবং তিনটি ওয়ালিটিউম ছাড়াও আরো অনেক উপাদান বিদ্যমান। যখন উপাদানসমূহ এটোমের ওজন অনুযায়ী ক্রমানুষারে সন্নিবেশিত থাকে তখন তাদের বিশেষ উপাদানগুলোর পরিবর্তন চক্রাকারে এবং বৈকল্পিকভাবে পূনরাবৃত্তি হতে থাকে। যে সমস্ত উপাদান সমান্তরাল সারীতে অবস্থিত তারা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে শুধুমাত্র একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রোনের পার্থক্য রাখে। আর যেগুলো দৈর্ঘ্যভাবে সারীতে অবস্থিত তাদের বাইরের কক্ষগুলোতে ইলেকট্রোনের সংখ্যা পরস্পর সমান। ইলেকট্রোনের সংখ্যা সমপরিমাণ হওয়ার কারণে যে সমস্ত উপাদান দৈর্ঘ্যভাবে সারীতে অবস্থিত তারা সমগুণ সম্পন্ন। যেহেতু প্রতিটি লিটুয়্যাম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রোবিডিয়াম, কাইযিয়াম ও ফ্রানসিয়ামের বহির্কক্ষে একটি করে ইলেকট্রন বিদ্যমান সেহেতু তারা সমগুণ সম্পন্ন এবং একই পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত। আর যেহেতু ছয়টি উপাদান যথা হেলিয়াম, নেউন, আরগুণ, কারিপটুন, যানুন ও রাদুন এর চতুরপার্শ্বে কতগুলো অপরিবর্তনশীল মিশ্রণবেষ্টনী দিয়ে রেখেছে তাই তারা অন্যান্য উপাদানের সাথে মিলিত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করে না। এ কারণে সেগুলোকে অকেজো গ্যাস বলা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল উপাদানগুলোও তাদের সমগুণসম্পন্ন উপাদান এবং ইলেকট্রোনের সংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হয়েছে। আমাদের সাধারণ বিবেকই বলে দিবে যে, এ ধরণের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এবং বিষ্ময়কর সন্নিবিষ্টতা কখনো কোন দূর্ঘটনার ফসল হতে পারে না।

নভোপুঞ্জ এবং পৃথিবীর কল্পনাতীত বিশালতা :

কোন সুস্থ মস্তিস্ক ব্যক্তির পক্ষে ভূ- মন্ডলের অস্তিত্ব অস্বীকার করার জো নেই। তেমনি নভোপুঞ্জও কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ভূ- মন্ডলের ওজন ও আয়তনের পরিমাণ অস্বাভাবিক বেশী। পৃথিবীর ওজন আনুমানিক ৬৬০০ বর্গ বিলিয়ন টন। যেখানে এক মিলিয়ন টনের প্রকৃত অনুমাপ

মানুষের জন্যে এক দুস্কর ব্যাপার সেখানে এক বিলিয়ন অথবা বর্গ বিলিয়ন তো অনেক দুরের কথা। এত বৃহৎ এ ভূ- মন্ডলের ব্যাপারে স্বভাবতঃ- ই প্রশ্ন জাগ্রত হয়, 'এ বৃহৎ গ্রহ যার নাম ভূ- মন্ডল, তা কোত্থকে এসেছে?'

বিশিষ্ট জ্যোতিষবিদগণ বলেন, আমাদের ছায়াপথের ন্যায় একলক্ষ ছায়াপথ বিশ্ব- প্রকৃতিতে বিদ্যমান। প্রশ্ন হতে পারে, এ আকাশপুঞ্জের সর্বমোট ওজন কত হবে? শুধুমাত্র এ বিষয়ে সামান্য একটু চিন্তা একজন মানুষকে বিষ্মিত করে তুলতে যথেষ্ট। তাই এ বৃহৎপুঞ্জের চির বিদ্যমানতার ধারণা একটি অর্থহীন বিশ্বাসের শিকার। কেননা, সকল বস্তু পরিবর্তনশীল অর্থাৎ বৃদ্ধি পায় এবং পর্যায়ক্রমে প্রসার লাভ করে। এমনকি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যথেষ্ট মনোযোগের মাধ্যমে প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টি- সূচনা নির্ণয় করে দিতে সক্ষম। সুতরাং সঠিক ও বিবেক সমর্থিত ধারণাটি হচ্ছে যে, এগুলো সৃষ্ট বস্তু বৈ অন্য কিছু নয়। এ ধরনের বৃহৎ ও সুশৃঙ্খল সৃষ্টি ব্যবস্থা কি কোন প্রস্তুতকারক বা শক্তিশালী স্রষ্টার প্রয়োজন অনুভব করে না?

কয়েকটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত :

প্রাণীদেহের বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যে ভূ- মন্ডলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কার্যক্রম সংঘটিত হয়ে থাকে। তন্মোধ্যে নিম্নে কয়েকটি কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো :

এক : ভূমির উপরিপৃষ্ঠে জীবন রক্ষী গ্যাস থেকে যে বায়ুমন্ডল গঠিত হয়ে থাকে তার ঘনত্ব ও বেধ প্রায় আটশত কিলোমিটার। এত অধিক ঘনত্ব থাকার কারনেই তা ভূ- পৃষ্ঠকে ঢাল স্বরূপ, শূন্যাকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত প্রতিদিন বিশ মিলিয়ন প্রাণহরণকারী প্রস্তর থেকে প্রতিরক্ষা করতে পারে। এসমস্ত পাথর প্রতি সেকেন্ড প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে ভূ- পৃষ্ঠে আঘাত হেনে থাকে।

দুই : বায়ুমন্ডল ভূ- পৃষ্ঠের তাপমাত্রাকে জীবন ধারণের উপযোগী করে গড়ে তোলে এবং মহাসাগর থেকে বাস্প ও প্রয়োজনীয় পানি শুস্ক এলাকায় স্থানান্তরিত করে থাকে। আর এরূপ কার্য সম্পন্ন না হলে মহাদেশগুলো বসবাসের অনুপযুক্ত এক একটি বৃহৎ শুস্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যেত।

তিন : পানির দৃষ্টি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘ শীত মৌসুমে মহাসাগর, সাগর ও নদীগুলোতে জীবন যাত্রা অব্যাহত রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তন্মোধ্যে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষন এবং স্বীয় ওজন বরফে রূপান্তরিত হওয়ার তাপমাত্রার চেয়ে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে ধারণ অন্যতম। এ কারণেই নদী ও সাগরের তলদেশে পানি জমাট হতে বাধাগ্রস্থ হয়। অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হচ্ছে, পানির ওজন বরফের ওজনের চেয়ে বেশী করে সংরক্ষিত রাখা। সেজন্যে বরফ পানির উপর ভেসে থাকতে সমর্থ হয়। আবার যখন পানি বরফে পরিণত হতে থাকে তখন প্রচুর পরিমাণ তাপ পানির নিম্নভাগ থেকে নিঃসৃত হয়ে বরফ গলানোর কাজে সহায়তা করে থাকে।

চার : মৃত্তিকা তার স্বগর্ভে এমন সব খনিজ পদার্থ ধারণ করে রাখে যেগুলোকে উদ্ভিদ সংগ্রহণ করে প্রাণী জগতের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যরূপে বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

পাঁচ : ভূ- মন্ডলের আয়তম যদি চন্দ্রের ন্যায় ক্ষুদ্র অথবা বর্তমান আয়তনের এক চর্তুাংশ হতো তা’হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পানি ও বায়ু ধারণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতো আর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতো যেখানে প্রাণীর জীবনাবসান নিশ্চিত হয়ে পড়তো। অপরদিকে যদি পৃথিবী স্বীয় ওজন অপরিবর্তীত রেখে সূর্যের ন্যায় বৃহৎ আকার ধারণ করতো তা’হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একশত পঞ্চাশ গুণ অধিক বেড়ে যেতো আর বায়ুমন্ডলের উচ্চতা প্রায় দশ কিলোমিটার নিচে নেমে আস্তো। পরিণতিতে পানির বাষ্প হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়তো আর বায়ুর চাপ প্রায় ১৫০ বর্গকিলোগ্রামে উপনীত হতো। তদর্থে এক কিলোগ্রাম ওজনের প্রাণী একশত পঞ্চাশ কিলোগ্রামে পরিণত হয়ে যেতো আর তখন মানুষের উচ্চতা কমে কাঠবিড়ালীর ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতিতে পরিণত হতো।

ছয় : যদি ভূ- মন্ডল থেকে সূর্যের দূরত্ব বর্তমান দূরত্বের দ্বিগুণ হতো তা’হলে সূর্য থেকে গৃহীত তাপমাত্রা বর্তমান তাপমাত্রার এক চর্তুাংশে অবতরণ করতো আর সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিনরত পৃথিবীর গতিবেগ বর্তমান গতিবেগের অর্ধেকে নেমে আসতো। ফলে বিশ্বের সকল প্রাণী ঠান্ডায় জমাট বেধে যেতো। আর যদি পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বর্তমান দূরত্বের অর্ধেক হতো তা’হলে

উষ্ণতা চারগুন, সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিনের গতিবেগ দ্বিগুন, ঋতুর সময়কাল অর্ধেক (ঋতুর সময়কাল পরিবর্তন সাপেক্ষে) হয়ে যেতো এবং ভূ- পৃষ্ঠে এতবেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠতো যে সেখানে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়তো।

এগুলো ছিল বিশ্ব প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত সুষ্ঠ ও সূক্ষ্ম আইন- কানুন, বিধি- বিধান এবং অত্যাশ্চর্য সু- শৃঙ্খলার তাক লাগানো প্রকান্ডতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এ 'প্রসঙ্গে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ' শীর্ষক গ্রন্থে আরো অধিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে উল্লেখিত একটি উদাহরণ- ই একজন বুদ্ধিমান ন্যায়বিচারকের সমক্ষে সৃষ্টি সূচনার পরিচয়ের এক মহাগ্রন্থ উন্মোচন করে দিতে সক্ষম।

তাই জনৈক পারস্য কবি যথার্থই বলেছেন :

> "সচেতন ব্যক্তির দৃষ্টিতে সবুজ পাতা বৃক্ষলতার
> প্রতিটি পাতা- ই এক একটি গ্রন্থ আল্লাহকে চেনার।"

দুর্ঘটনা নাকি কোন মহাশক্তির পরিচালনা?

সৃষ্টিজগতের বিশালতা ও তার বিস্ময়কর শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং সুনির্দিষ্ট বিধি- বিধান প্রাথমিক নিম্নের দুটি সম্ভাবনার ফলাফল ধরে নেয়া যেতে পারে।

এক : সব কিছুই কোন একটি সংঘর্ষ এবং পারস্পরিক মিশ্রনের ফল অর্থাৎ দর্শনের পরিভাষায় সৃষ্টির অস্তিত্ব ও তার বিস্ময়কর নিয়মশৃঙ্খলার জন্যে কোন বস্তুগত কার্যকারণ- ই যথেষ্ট, অন্য কোন ক্রিয়াশীল কার্যকারণের প্রয়োজন নেই।

দুই : বিশ্ব সৃষ্টি ও তার সূক্ষ্ম নিপুণতার যথাযথ ও অপরিবর্তনীয় বিধি- বিধান, সুউচ্চ কোন বিবেক- শক্তি ও প্রজ্ঞার পরিচালনার- ই কারণ আর তিনিই হচ্ছেন বিশ্বব্রক্ষ্মাণ্ডের ক্রিয়াশীল সূচনাশক্তি ।

এখন আমাদের বিবেককে উপরোক্ত দু'টি মতামতের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্যে আহ্বান জানানো উচিত। এক্ষেত্রে তো আর পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান চলে না। একটি

মাত্র উপায়ে অন্বেষণ ও গবেষণা চালানো যেতে পারে, আর তা হলো সুস্থ বুদ্ধি- বিবেকের প্রয়োগ যা অকলুষিত প্রকৃতি এবং গোড়ামী ও একগুয়েমী বিবর্জিত অন্তর আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। এ পর্যায়ে আমরা দু'জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মতামত উপস্থাপন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছি।

পদার্থবিদ এ্যাডভিন ফ্যাষ্ট বলেন :'তিনটি মূল উপাদান যথা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন হচ্ছে প্রতিটি প্রাণীদেহের সর্ব প্রাথমিক সামগ্রী। আর উক্ত তিনটি উপাদানের সাথে সামান্য নাইট্রোজেন গ্যাস ও অন্যান্য উপাদানের মিশ্রন আছে। ... এটা কি সম্ভব যে প্রনীদেহে তার উপাদানেরও স্বেচ্ছাকৃত মিশ্রণ কোন এক দুর্ঘটনার ফসল? কেন আমরা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে ব্যক্ত করছি না যে, প্রাণীকুলের সৃষ্টিকর্তাই এরকম ইচ্ছা পোষন করেছেন? কেন আমরা সৃষ্টি অস্তিত্বের আলোচনায় একটি সহজ শব্দ 'আল্লাহ্' উচ্চারণ থেকে বিরত রয়েছি? যদিও এ শব্দটি অত্যন্ত সাধারণ ও সহজ তথাপি এর মর্যাদা ও আড়ম্বরতা গগন চুম্বী।[১৬]

'**জন এ্যাডওয়ালক বুহলের**' **নামক একজন রসায়নবিদ বলেন** : 'যদি সম্ভবনাময়ী হিসেবের ভিত্তিতে প্রকৃতির যে কোন একটি কাজের ফলাফল অর্জনের জন্যে দুর্ঘটনাকে আমরা কারণ হিসেবে ধরে নেই তা'হলে প্রত্যক্ষ করতে পারবো যে, এ সময়কাল উক্ত কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়, যদিও ভূ- পৃষ্ঠের বয়স তিন বিলিয়ন বৎসর ধরা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রোটনের আদি উপাদান থেকে তার কণার সৃষ্টি। শুধুমাত্র স্বাধীন ও প্রত্যয়শীল একটি পথ প্রদর্শকের অস্তিত্ব স্বীকারের মাধ্যমেই সুশৃঙ্খল ও সুসামঞ্জস্য ব্যবস্থাপনা থেকে দুর্ঘটনা বা সংঘর্ষের ধারণাকে পৃথক করা যেতে পারে।[১৭]

১০

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অপনোদন

বস্তুবাদীরা আস্তিকবাদীদের উপর জোরালো আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন এই বলে যে, "প্রকৃতিই হল সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নির্মাতা। এ প্রকৃতির কারনেই সকল বস্তু গতিশীল ও ক্রিয়াশীল অবস্থায় রয়েছে।" - এর উত্তর আমরা দ্ব্যার্থহীন ভাষায় অপনোদন করতে সক্ষম। আমাদের উপযুক্ত জবাব নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

প্রথমতঃ আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, 'প্রকৃতি কি কোন বস্তু নাকি অন্য কিছু?' আরো ভালো করে বললে এভাবে বলা যায়, 'প্রকৃতি কি একটি বস্তুগত সত্তা?' প্রতিত্তোরে তারা অবশ্যই বলবেন, 'নিশ্চয়ই বস্তুগত সত্তা'। কেননা, উত্তর ইতিবাচক না হয়ে পারে না। তার কারণ, বস্তুবহির্ভূত কোন সত্তার অস্তিত্বে তারা বিশ্বাসী নন।

পদার্থ বিজ্ঞানে বস্তুর সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিটি বস্তু স্থান দখল করে, সময়ের মধ্য সীমাবদ্ধ, ওজন ও আয়তন আছে। যে সত্তা নিজের অস্তিত্ব লাভের জন্যে স্থান, কাল, পাত্র, আয়তন ও ওজনের মুখাপেক্ষী সে কি করে অন্য বস্তুকে সেগুলো দান করতে পারে? দর্শনের প্রণিধানযোগ্য যথার্থ নীতিটি হচ্ছে- - "শূন্য হাতের কেউ অন্যের হাতকে ভরে দিতে পারে না।" যার যে জিনিষ নেই সে কি করে অন্যকে সে জিনিষ দান করতে পারে? তাই সৃষ্টিকর্তা কোন বস্তুগত সত্তা হতে পারেন না। এ ধরনের ধারণা নিতান্তই অবাস্তব।

অধিকন্তু বস্তুগত প্রকৃতির কোন জ্ঞান- বৃদ্ধি, বিবেক ও প্রজ্ঞাশক্তি নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বজগতের প্রতিটি সৃষ্টিতে আমরা সাংঘাতিক জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা শক্তির বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করি। যদি প্রকৃতির ন্যায় নির্বোধ কোন সৃষ্টিকারককে সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেয়া হয় তাহলে বলতে হবে যে এ ধরনের বক্তব্য দানকারীরাও প্রকৃতির মতই নির্বোধ। কেননা যে নির্বোধ, প্রজ্ঞাহীন সে কিভাবে এতসব জটিল ব্যবস্থাপনার প্রবর্তক হতে পারে?

বস্তুত্ব : বস্তুগত সত্তা নির্ভরশীল সত্তার সমতুল্য। বস্তু যেমনিভাবে অস্তিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য কোন সত্তার মুখাপেক্ষী তোমনিভাবে তার অনবরত অস্তিত্বমান থাকার জন্যেও অপরের সাহায্যের প্রয়োজন। মোটকথা বস্তু আপাদমস্তক একটি নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী সত্তা।

আর যদি প্রকৃতি একটি বস্তুগত সত্তা হিসেবে অন্য সব বস্তুর স্রষ্টা হয়ে থাকে তা'হলে প্রকৃতির স্রষ্টা কে? উত্তরে যদি বলা হয় প্রকৃতি নিজেই তার স্রষ্টা তা'হলে দর্শনের নীতির বিরোধীতা করা ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর থাকবে না। দর্শনের সুপ্রমাণিত সুত্রটি হচ্ছে "সকল কার্যের কারণ আছে।" অতএব প্রকৃতির ন্যায় একটি বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্যে নিশ্চয়ই একটি কার্যকারণ প্রয়োজন। সুতরাং প্রকৃতির ন্যায় কোন বস্তুজাত সত্তা স্রষ্টার আসন দখল করতে পারে না। কেননা সে নিজেই সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহারে আমাদেরকে প্রাকৃতিক তথা বস্তুগত জগতের ঊর্দ্ধে এমন এক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতেই হবে যিনি সকল বস্তুগত সত্তার বহির্ভূত পরম সত্তা, যিনি আপন সত্তাবলে অস্তিত্বমান। তাকে সৃষ্টির কোন প্রয়োজন হয়নি। সকল কিছু তারই সৃষ্টি। তিনি একজন অমুখাপেক্ষী সত্তা। প্রকৃতিকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই হচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহান প্রতিপালক। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেন :

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)

অর্থাৎ : এবং হে মানবসকল, তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সকল কিছুর অমুখাপেক্ষী এবং সকলের প্রসংশারযোগ্য।(ফাতির, আঃ নং- ১৫।)

এতক্ষনে আমরা এ সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছি যে, সমস্ত নির্ভরশীল সম্ভাব্য অস্তিত্বের মূলে একটি কার্যকারণ রয়েছে, যিনি হচ্ছে স্বয়ম্ভু ও স্বতঃস্ফুর্ত সত্তা। তিনি সকল কিছুই স্রষ্টা, তাকে অন্য কেউ সৃষ্টি করেনি।

দর্শনের সূত্রানুসারে "প্রতিটি ফলাফলের পেছনে একটি কারণ বর্তমান।" সুতরাং শুধুমাত্র আদিসত্তাতে এসে দর্শনের সেই নীতি লংঘন হয়ে যায়- যা বুদ্ধিবৃত্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে

উঠেছিল। কেননা আস্তিকবাদীদের মতে স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের জন্যে কোন কার্যকারনের প্রয়োজন নেই।

বস্তুবাদীদের পক্ষ থেকে এখানে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটির অবতারণা করা হয় তাহলো, ‘‘এক্ষত্রে দর্শনের নীতির ব্যতিক্রম ঘটে কেন?’’ সংক্ষেপে এবং সহজভাবে বলতে গেলে তাদের প্রশ্নটি এভাবে বলা যায় ‘‘সবকিছুর সৃষ্টিকারক আছে, আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা কে?’’ এর উত্তরে বলা যায়,

প্রথমত : প্রশ্নটি বস্তুবাদী ও আস্তিকবাদী উভয়ের মধ্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। কেননা তারা উভয়েই কারণহীন স্বয়ংসৃষ্ট, শাশ্বত সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। শুধু এখানেই পার্থক্য যে, আস্তিকবাদীরা সকল সত্তার মূল হিসেবে এমন এক সত্তায় বিশ্বাসী যিনি পার্থিব জগতের উর্দ্ধে, বস্তুনিচয়ের বাহিভর্তূ , সমস্ত নির্ভরশীল সত্তার ধারাবাহিকতা যেখানে গিয়ে স্থিমিত হয়ে যায়। আর বস্তুবাদীরা এমন এক সত্তার কথা বলেন যিনি বস্তুনিচয়ের সর্বপ্রথম অস্তিত্ব, যার থেকে সকল বস্তু নির্গত। দর্শনের ভাষায় তাকে বলা হয় আদি বস্তু। আর বস্তুবাদীরাও আদিবস্তুর ব্যাপারে বিশ্বাস করেন যে তা স্বয়ম্ভু ও স্বয়ংসৃষ্ট। অতএব, যদি দর্শনের নীতির বরখেলাপ কোন ব্যতিক্রম কিছু ঘটে থাকে তা’হলে সে আপত্তি উক্ত দুই মতবাদের উপরেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয়ত : দর্শনের উক্ত সূত্রটি (সকল কার্যের কারণ বিদ্যমান) শুধুমাত্র বস্তুজগত ও সম্ভাব্য নির্ভরশীল সত্তাসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আস্তিকবাদীদের মতানুসারে স্রষ্টা অবস্তুগত, স্বাধীন, প্রকৃতি- উর্দ্ধ একটি সত্তা, যিনি শাশ্বত, চিরঞ্জীব ও চিরন্তন। তাই তিনি সকল ধরনের কার্যকারণ থেকে মুক্ত। মুলতঃ তিনি নিজেই কার্যকারনের স্রষ্টা। কার্যকারনের ছোঁয়া তারই দেহে স্পর্শ করবে যিনি বস্তুগত সত্তা, সে সত্তা পূর্বে অস্তিত্বহীন ছিল, পরে অস্তিত্বমান হয়েছে। যে স্রষ্টার ধারণা আস্তিকবাদীরা দেয়, তিনি হলেন অস্তিত্বের মূল। তিনি সর্বকাল জুড়ে অস্তিত্বমান ছিলেন এবং অব্যাহতভাবে সত্তাশীল থাকবেন। তিনিই প্রথম যিনি সকল বস্তুনিচয়ের পূর্ব হতে বিরাজমান। অনস্তিত্বের সম্ভাবনা তার প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, ‘লবনের স্বাদ কটা কেন?’ অথবা ‘চিনিদ্রব্য মিষ্টি কেন?’ তাহলে উত্তরে বলতে হবে যে, ‘লবনের প্রকৃতিই হল কটার গুণ বর্তমান থাকা অথবা চিনির জন্যে

মিষ্টির বৈশিষ্ট্যই হল তার সহজাত। এখন যদি লবন বা চিনি থেকে তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য তুলে নেয়া হয় তাহলে সেগুলো লবন বা চিনিই থাকবে না'। তাই উক্ত প্রশ্নের অর্থাৎ 'কেন' এর উত্তর হচ্ছে এগুলোর সহজাত প্রকৃতি। তদ্রূপ আল্লাহ্ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে একই ধরনের উত্তর আসবে। 'আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?' এই প্রশ্নটিই ভুল। কেননা মহান আল্লাহর সহজাত বৈশিষ্ট্যই হল স্বয়ংসৃষ্টতা। বিশ্ব বিধাতার সারসত্তাই হলো সর্বদা অস্তিত্বমান থাকা এবং স্বয়ম্ভু ও স্বয়ংক্রিয় অবস্থা। যদি আল্লাহর জন্যে কোন সৃষ্টি কারণ নির্ণয় করা হয় তা'হলে তিনিও আমাদের ন্যায় সৃষ্ট বস্তু হয়ে পড়বেন, অবস্তুগত সত্তা থেকে বস্তুগত সত্তায় নেমে আসবেন।

তিনি পরম পরিপূর্ণ সত্তা। আদি সত্তা ও এই আল্লাহ্- ই। আদি ও অন্তকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আদি ও অন্তের প্রভাবমুক্ত তিনি। তিনি সকল কিছুর সূচনাকারী।

১১

আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে নবী বংশের ষষ্ঠ পুরুষ (সঃ)

এক : জনৈক ব্যক্তি ইমাম জাফর বিন মুহাম্মদ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালো, আল্লাহকে চেনার জন্যে আমাকে দিক নির্দেশনা দিন।

ইমাম প্রতিত্তোরে বললেন,

'জাহাযে কখনো আরোহণ করেছো?'

'হ্যাঁ' উত্তর দিল লোকটি।

ইমাম বললেন,

'কখনো কি এমনটি হয়েছে যে তোমাদের জাহাযের পাটাতন ভেঙ্গে গিয়েছিল? আর তুমি সাতারও জানতে না?'

'হ্যাঁ' এমনটি হয়েছিল, লোকটি বলল, 'ঐ সীমাহীন হতাশা ও অনন্ত নিরাশার মাঝেও কি তোমার অন্তরের গভীরে কোন অজানা শক্তির ঝংকার শব্দ হয়নি, যে তোমাকে এ মহাবিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে?'

ইতিবাচক উত্তর দিলো লোকটি এবং বললো,

'আমি তখন অন্তর থেকে অনুভব করছিলাম যে, এমন একটি শক্তি আছে যিনি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন'।

লোকটিকে উদ্দেশ্য করে ইমাম বললেন, 'তুমি যে শক্তির উপস্থিতি অনুভব করছিলে তিনি- ই মহান আল্লাহ, সকল কিছুর স্রষ্টা।[১৮]

দুই : একদা মুফায্যাল নামক ইমাম জাফর বিন মুহাম্মাদের একজন ঘনিষ্ট ছাত্র ইমামের খেদমতে আরজ পেশ করলো,

‘আমরা যখন এ বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা- বিন্যাসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করতে চেষ্টা করি তখন একদল নাস্তিক ও বস্তুবাদী লোক বলে উঠেন ...ওসব কিছুকে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে’।

ইমাম বলেন, ‘ঠিক আছে, যদি প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অর্থ এমন কোন সত্তাকে বুঝানো হয়ে থাকে যিনি জ্ঞানী, শক্তিশালী, স্বাধীন ও প্রজ্ঞাবান, তাহলে তিনিই মহান আল্লাহ। ভুলবশত : তারা নামকরণ করেছেন প্রকৃতি। আর যদি প্রকৃতির অর্থ এমন কোন অস্তিত্বের কথা বোঝানো হয়ে থাকে যার জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা নেই তবে সে তো এক কল্পনার বস্তু। বিশ্বজগতের এতসব বিস্ময়কর শৃঙ্খলা- বিন্যাস ও ঐক্য সামঞ্জস্য ব্যবস্থাপনা কখনো প্রকৃতি নামক কোন নির্বোধ জ্ঞানহীন ও অন্ধ- বধির সত্তার মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে না’।[১৯]

১২

বিশ্ব স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়

মানব জাতির সহজাত বৈশিষ্ট্য হল শক্তিশালী কোন সত্তার সম্মুখে নিজেকে অবনত রাখা। শৈশব থেকে যখন মানব বিচার- বুদ্ধি উন্নতি লাভ করতে থাকে তখন থেকেই প্রকৃতগতভাবে তার মনে এ চিন্তার উদ্রেক হয় যে, এতসব আশ্চর্য ও বিষ্ময়কর সৃষ্টির কি কোন শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা নেই? তখন থেকে শুরু হয়ে যায় তার কৌতুহলী জিজ্ঞাসা। সে খুজতে থাকে প্রকৃত সৃষ্টিকারককে। ক্রমশঃই তার কাছে সবকিছুর- ই কোন সৃষ্টিকারক আছে বলে ধারণা হতে থাকে। এ ব্যাপারে প্রতিটি মানব প্রকৃতিই বলে দেবে পৃথিবীর জন্যেও অবশ্যই কোন সৃষ্টিকারক আছেন। তাই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা সর্বকালেই অধিকাংশ বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। আল্লাহকে চেনার ক্ষেত্রে মানুষের তেমন কোন বেগ পেতে হয় না, কেননা তার প্রকৃতিই তাকে দিক নির্দেশনা দিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের পর তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী চিহ্নিত করতে গিয়ে মানুষ প্রচুর ভুলের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। আল্লাহ যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন সত্তা নয় সেহেতু তার বৈশিষ্ট্যাবলী চিহ্নিত করতে অনেকাংশে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে। কেননা, বস্তুগত সত্তার বৈশিষ্ট্য আমাদের জন্যে বোধগম্য নয়। আর সেজন্যে এক্ষেত্রে খুব ভেবে চিন্তে আল্লাহর বৈশিষ্ট্য নিরূপন করা একান্ত প্রয়োজন।

মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে আমরা বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী মানুষের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি। কেউ একত্ববাদী, আবার কেউ দ্বিত্ববাদী। কেউ আবার বহুত্ববাদে বিশ্বাসী। কেউ অগ্নিপূজক আবার কেউ মূর্তিপূজক।

যখন কেউ প্রকৃতির তাড়নায় বিশ্ব বিধাতার অবস্থান অন্বেষণ করে তখন তার দৃষ্টিগোচর হয় এক বিশালাকৃতির মহাকাশ, বিরাটাকার সূর্য যা সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত ও উত্তপ্ত করে। রাত্রের অন্ধকারে প্রত্যক্ষ করে আকাশের বুকে চন্দ্র ও তারকারাজী। বৃহদাকার পাহাড়- পর্বত, গাছ- পালা, নদ- নদী প্রভৃতি আরো শক্তিশালী ক্রিয়া- কর্মের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় প্রতিটি মানুষের

দৃশ্যপটে। এক্ষেত্রে কোরআনে উল্লেখিত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'সূর্য প্রভাতে উদয় হয় আবার সন্ধ্যাবেলা অস্তমিত হয়ে যায়। তেমনি চন্দ্র রাত্রে প্রকাশিত হয় আবার প্রত্যুষে সূর্যের আলোর সম্মুখে বিলিন হয়ে যায়। এ সব কিছুই পরিবর্তনশীল। যে সত্তা সর্বদা পরিবর্তনশীল ও বস্তুজাত সত্তা তা কখনো মূল স্রষ্টা বা আদি সত্তা হতে পারে না। আমাদের স্রষ্টার কখনো অনস্তিত্বের রূপ ছিল না যে, পরবর্তীতে সময়ের আবর্তনে অস্তিত্বের আকার ধারণ করেছে। সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকারক এমন পরাক্রমশালী সত্তা যার নির্দেশে পরিচালিত হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছু।'

লক্ষনীয় যে, এ বিশ্ব সৃষ্টির শৃঙ্খলা বিন্যাস ও বিরাজমান ভারসাম্য দর্শনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের পরিচয় লাভ যেমনি অত্যন্ত সহজ, তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা তেমনি কঠিন। কেননা, তিনি তো আমাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন সত্তা নন। সুতরাং আল্লাহর বৈশিষ্ট্য পরিচয়ের জন্যে প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত জীব ও জড় পদার্থের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থেকে তাকে আলাদা করে ভাবতে হবে। তার কারণ, তিনি প্রকৃতির কোন বস্তুর জাত ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নন। তিনি আমাদের সকল কল্পনা, রূপকথা ও কল্প কাহিনীর বহির্ভুত এক সত্তা। এ বস্তু জগতের কোন কিছুর সাথে তাকে তুলনা করা চলে না।

এ কারণে আল্লাহর অস্তিত্বের পরিচয়ের পর তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রকৃত কারণ হল, মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার গুণাবলীকে প্রকৃতির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও দর্শনীয় জীব ও জড় পদার্থের সাথে তুলনা দিয়ে নির্ণয় করতে সচেষ্ট। আর এ জন্যেই এতসব মতবাদের উদ্ভব হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে মানব মনে প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে, 'এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা কি একক নাকি একাধিক?'

উক্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্যে আমাদের পরবর্তী আলোচনা ফলদায়ক প্রমাণিত হতে পারে।

১৩

আল্লাহর একত্বের প্রমাণ

শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত

সারসংজ্ঞা ও সত্তাশীল অস্তিত্ব

শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত

কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, 'আপনার দেশের জন্যে কি দু'জন রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজন?' নিশ্চয়ই কোন বিবেকবান ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রের জন্যে দু'জন রাষ্ট্রপ্রধানের কথা ব্যক্ত করতে পারেন না। একইভাবে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'কোন একটি বিষয়ের একটি ক্লাশের জন্যে একই সঙ্গে দু'টি শিক্ষকের প্রয়োজন আছে কিনা?' আপনি অবশ্যই ইতিবাচক উত্তর দিতে পারেন না। কেননা, একজন সুস্থ বিবেক- বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তি এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবেন যে, কখনো একই কাজে একই সময়ে একই পরিধিতে একাধিক দায়িত্বশীলের অস্তিত্ব, শৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে না। প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করবেন, এর ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে বাধ্য।

আমরা বিশ্ব জগতের কোথাও কোন বিশৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই না। সর্বত্র সুশৃঙ্খলতা ও ভারসাম্য বিরাজমান। সর্বক্ষেত্রে জীব ও জড়বস্তুতে আমরা সুসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত । বস্তুজগতের একটি অণু- পরমাণু থেকে সর্ববৃহৎ ছায়াপথ পর্যন্ত সর্বস্থানে আমরা প্রত্যক্ষ্য করি একটি মাত্র নির্দিষ্ট নিয়ম- নীতি। কোথাও নির্ধারিত নীতির বরখেলাফ হচ্ছে না। এ থেকে কি এটা প্রমাণ হচ্ছে না যে, যদি সৃষ্টিজগতের জন্যে একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব বর্তমান থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই এ ধরণের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও নিখুত পরিমাপ সর্বত্র পরিলক্ষিত হতো না। তাই ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বীকার করে নিতে হয় যে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পরিচালনায় একাধিক সত্তার প্রভুত্ব নিতান্তই একটি ভিত্তিহীন বিশ্বাস মাত্র, যা কোন ক্রমেই একজন স্বাধীন বিবেকবান মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

নিম্নলিখিত উদাহরণটি বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে :

ধরুন ৫০০ পৃষ্ঠার একটি বই আপনার সামনে। আপনি এখনো পড়ে দেখেননি। আপনি জানেন না যে এ পুস্তকের সব অধ্যায় একজন গ্রন্থকারের লেখনীর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে, নাকি প্রতিটি অধ্যায়ের জন্যে পৃথক পৃথক লেখকের প্রয়োজন হয়েছে? এর প্রকৃত বিষয় উদঘাটনের জন্যে

নিশ্চয়ই আপনাকে সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করতে হবে। অধ্যয়ন করে যদি দেখেন এ গ্রন্থের মূল বিষয়াদি, বাক্য গঠন, ব্যাখ্যা- রচনা, যুক্তি- প্রমাণের পদ্ধতি ও পন্থা একই রকম আর প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে এক প্রকার সামঞ্জস্য বিদ্যমান তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে এ গ্রন্থের সকল বিষয় ও অধ্যায়ের রচয়িতা একজন ব্যক্তি। কেননা যদি উক্ত গ্রন্থ্ রচনা দু'জন বা ততোধিক গ্রন্থ্কারের মাধ্যমে সংগঠিত হতো তা'হলে যে কোন প্রকারে পুস্তকের মধ্যে অনৈক্য ও অসামঞ্জস্যতা পাঠকের সামনে ফুটে উঠতো।

তদ্রুপ মহান আল্লাহর সৃষ্টিকুলকে যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান পুস্তকের সাথে তুলনা করি তা'হলে দেখতে পাব যে এ বইতে কোন প্রকার খুঁত নেই। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে দৃষ্টিগোচর হবে এক বিস্ময়কর শৃঙ্খলা- বিন্যাস, পরস্পরিক সহযোগীতা ও ঐক্য- সামঞ্জস্য। শত- কোটি নক্ষত্র ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে দ্রুত গতিতে ধাবমান থাকা সত্ত্বেও কখনো পথভ্রষ্ট হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না। তারা সর্বত্র একটি মাত্র পরিচালকের কর্তৃত্ব মেনে চলছে, যা তাদেরকে দিয়েছে এক ও অভিন্ন পথের নিশানী। যদি সৃষ্ট বস্তুসমুহের সৃষ্টি ও পরিচালনায় একাধিক স্রষ্টার প্রভুত্ব বিরাজমান থাকতো তাহলে কখনো এ ধরনের শৃঙ্খলা ও সহযোগীতা পরিদৃষ্ট হতো না। তিনি আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই চুড়ান্ত পরিচালক ও অভিভাবক। সৃষ্টি জগতের সকল কিছুর ব্যবস্থাপক তিনিই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলছেন :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

অর্থাৎ : বল (হে মুহাম্মাদ, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং জন্ম লাভও করেন নি। এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (আল্ ইখলাস, আঃ নং- ১- ৪।)

সারসসংজ্ঞা ও সত্তাশীল অস্তিত্ব

বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের সামনে অসংখ্য জীব ও জড়বস্তু দৃশ্যমান। বস্তুনিচয়ের মুখোমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দু'টি দিক অবলোকন করি। একদিকে জীব ও জড়

বস্তুসমূহের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণ ও পার্থক্যসহ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। অপরদিকে তারা সকলে সত্তাশীল, অস্তিত্বমান। এ সত্তাশীলতা সবার মধ্যে সমান- ভাবে বিরাজমান, সার্বজনীন বিষয়। অন্যভাবে বলা যায়, নিঃসন্দেহে বহির্জগতের দৃশ্যমান বস্তুসমুহ যেমন : সত্তাশীল মানুষ, সত্তাশীল ঘোড়া, বৃক্ষ ইত্যাদি জড় ও জীব পদার্থ বিদ্যমান। অতএব, বহির্বিশ্বের প্রতিটি বস্তু দু'টি জিনিসের সমন্বয়ে দৃশ্যমান। একটি হচ্ছে ঐ বস্তুর সার সংজ্ঞা যার মাধ্যমে বস্তুনিচয়ের পরস্পরের পার্থক্য ও ভিন্নতা নির্ণয় করা যায়, যেমন আমরা বলে থাকিঃ এটা মানুষ, ওটা ঘোড়া, এটা বৃক্ষ ইত্যাদি। অপরটি হচ্ছে সত্তাশীলতা। প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুর উপর এ সত্তাশীলতা আরোপ করা যেতে পারে। কিন্তু সারসংজ্ঞা বিভিন্ন বস্তুর জন্যে পৃথক পৃথকভাবে আরোপিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বস্তুনিচয়ের একটা অংশ মানুষ, আরেকটি অংশ ঘোড়া ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিটি সারসংজ্ঞা পৃথক পৃথকভাবে বস্তু জগতের এক একটি অংশের জন্যে প্রযোজ্য, একই সারসংজ্ঞা সবার জন্যে নয়। কিন্তু সত্তাশীলতা এ রকম নয়। সত্তাশীল বস্তু জগতের প্রতিটি বস্তুর উপর একক সত্তাশীলতার বৈশিষ্ট্য আরোপ করা যায়। তবে পৃথক পৃথকভাবে সত্তাশীল বস্তুর সার সংজ্ঞা বিরাজমান।

অতএব, এক কথায় বলা যেতে পারে যে, সম্ভাব্য নির্ভরশীল সত্তার মূল বিষয় বস্তুই হল সারসংজ্ঞা। কেননা সারসংজ্ঞা ব্যতীত কি করে একটি বস্তুর সাথে অন্যটির পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব? সকল দৃশ্যমান বস্তুর আলাদা নামকরণের কারণ- ই হচ্ছে এ সারসংজ্ঞা। প্রতিটি বস্তুর জন্যে পৃথক পৃথক সারসংজ্ঞা থাকার কারণেই তো আমরা তাদের নামকরণ করতে পারি। তা'হলে বুঝা গেল, বস্তুজগতের কোন কিছুই সারসংজ্ঞা বহির্ভূত নয় বরং এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতিটি সারসংজ্ঞাধারী বস্তুই সম্ভাব্য ও নির্ভরশীল সত্তা। কেননা, কোন স্ব-নির্ভর, অপরিহার্য, শাশ্বত ও আদি সত্তার জন্যে তা কোন সারসংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। যদি কোন কিছুর উপর সারসংজ্ঞা আরোপ করা হয় তা'হলে সেটা বস্তুগত সত্তার রূপ পরিগ্রহ করবে। আর আল্লাহ্ তো কোন বস্তুগত সত্তা নন কেননা বস্তুগত সত্তা সত্তাশীল হওয়ার জন্যে নিজেই অন্যের উপর নির্ভরশীল। সে কি করে বস্তু জগতের সব কিছুকে অস্তিত্ব দান করতে পারে? সুতরাং যে

সত্তা আপন থেকে সৃষ্ট, স্বনির্ভর ও অমুখাপেক্ষী তার কোন সারসংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। তাঁর জাত বা সারসত্তাকে কোন সংজ্ঞার বাধনে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাঁর সারসত্তা মানে সত্তাশীলতা। অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বকে তাঁর সারসত্তা থেকে কোনরূপে পৃথক করা সম্ভব নয়। যেহেতু তাঁর কোন সারসংজ্ঞা নেই তাই তিনি শুধুই অস্তিত্বমান। তিনি কোন যৌগিক সত্তা নন। যদি সারসংজ্ঞা ও সত্তাশীলতার সংমিশ্রনে তিনি অস্তিত্বমান হতেন তা'হলে তিনি হয়ে পড়তেন একটি যৌগিক সত্তা। আর সব যৌগিকই তার অংশসমুহের উপর নির্ভরশীল।

যেহেতু অপরিহার্য সত্তার জন্যে কোন সারসংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না তাই তিনি স্বয়ংসৃষ্ট, স্বাধীন এবং একক। কেননা, বহুত্বের ধারণার অর্থ হলো সত্তাশীল বাস্তবতার জগতে একটি অন্যটি থেকে পৃথক, তাদের প্রত্যেকে আপন বৈশিষ্ট্যবলে বিরাজমান। আর এ বহুত্বের সঙ্গে সারসংজ্ঞাহীন সত্তাশীলের ধারণা সংগতিপূর্ণ নয়। সুতরাং কোন অপরিহার্য ও পরম সত্তাশীল অস্তিত্বের কাছে একাধিকতা ও বহুত্ব সম্পূর্ণ অগ্রহণীয় ও পরিত্যাজ্য।

১৪

সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী

বিশ্ব বিধাতা পরিপূর্ণ ও পরম সত্তা। তাঁর জাত বা সারসত্তা সকল প্রকার গুণাবলীতে ভরপূর। কেননা, যা কিছু আমরা পরিপূর্ণতা বলে আখ্যায়িত করে থাকি তার সবকিছুই তাঁর সারসত্তায় বিরাজমান। আর যা কিছু আমাদের ধারণারও অতীত তাও তাঁর জন্যে ধারণা করা যায়। তিনি পরম পরিপূর্ণ।

তিনি সার্বজনীন প্রভু, তাঁর প্রভূত্বের সীমারেখা টানা যায় না। তিনি চিরন্তন, চিরঞ্জীব, শাশ্বত ও অমর। আল্লাহ্ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই চূড়ান্ত সার্বভৌম ও সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কোন স্থান, কাল বা পাত্রে সীমাবদ্ধ নন। স্থান, কাল, পাত্র তাঁর জন্যে কল্পনা করারও অশোভনীয়। আমাদের চর্ম চক্ষুর মাধ্যমে তাঁকে দেখা অসম্ভব। কেননা, তিনি তো কোন বস্তুগত সত্তা নন। তিনি কোন মিশ্র বা যৌগিক সত্তা নন। যে সমস্ত ত্রুটি ও অপূর্ণাঙ্গতা একজন পরম পরিপূর্ণ সত্তার জন্যে অশোভনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় তার সকল কিছু থেকে তিনি মুক্ত।

অধিকন্তু পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা, সব ধরনের কল্যাণ ও মঙ্গল বিষয়ক বস্তু, তাঁর- ই সৃষ্টি। তিনি সকল পরিপূর্ণতার পরিপূর্ণতাদানকারী। কেননা, পূর্বোল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি একজন অপরিহার্য সত্তা। কোন অপরিহার্য সত্তার জন্যে নির্ভরশীলতা ও মুখাপেক্ষিতার প্রশ্নই উত্থাপন হতে পারে না।

আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক, সুবিচারক ও সুবিচক্ষণ। তিনি হাকিম, সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও প্রজ্ঞাবান। তাঁর প্রতিটি কার্যে সুনির্দিষ্ট কারণ নিহিত থাকে। তিনি অযথা কোন কাজ সম্পাদন করেন না।

তিনি সকল সৃষ্টির নিয়ন্তা ও রিজিকদাতা। সকল সৃষ্টির রিজিক তিনিই প্রদান করে থাকেন। তিনি সর্বজ্ঞানী। অসম্ভব বস্তুজগত সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত।

তাঁর সকল গুণাবলী তাঁর জাত সত্তারই অন্তর্গত। আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী তাঁর জাতের উপর আরোপিত নাকি তাঁর জাতের সাথে একাকার? এ নিয়ে যুগ যুগ ধরে আশআরী ও মু'তাযিলিদের মধ্যে বিতর্ক হয়ে আসছে। মু'তাযিলিরা আল্লাহর একত্বের রক্ষা এবং চিরবিদ্যমান সত্তার একাধিকত্ব ও তাঁকে বস্তুগত গুণাবলীর সাথে তুলনার বিষয়টি গুড়িয়ে দেয়ার নিমিত্তে আল্লাহর গুণাবলীকে তাঁর জাত সত্তার সাথে মিশিয়ে একক সত্তার ধ্বনি দিয়ে আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করেছেন। তারা আল্লাহর জাত ছাড়া অন্য কিছুকে স্বীকার করতে একেবারে নারাজ। এ প্রসঙ্গে ক্বাজী আব্দুল জাব্বার আল মু'তাযিলি বলেন :

"আমাদের শেখ, আবু আলী বিশ্বাস করেন যে আল্লাহর জাতের মধ্যে চাঁরটি গুণ (ক্ষমতা, জ্ঞান, হায়াত বা জীবন ও অস্তিত্ব) যথোযোগ্য বিদ্যমান।

তিনি আরো বলেন, আমাদের শেখ, আবু হাশিম বলেন, এই (চার প্রকার) গুণাবলী আল্লাহর জাত সত্তার অন্তর্গত।

অতএব, উপরোক্ত দুই শেখের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে :

"আল্লাহ্ সুবহানাহু নিজ সত্তাতেই জ্ঞানী, শক্তিশালী ও জীবিত, জ্ঞান, ক্ষমতা ও হায়াতের মাধ্যমে নয়।"[২০]

আর আশআরীরা মু'তাযিলিদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আল্লাহর সিফাতকে তাঁর জাত থেকে আলাদা করে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাবলীর সাথে আল্লাহর গুণাবলীর তুলনা দিয়েছেন।[২১]

বস্তুতঃ আল্লাহর জাত সত্তার সাথে সাথে তাঁর গুণাবলীর অবস্থানও অনস্বীকার্য। তবে তাই বলে তাঁর গুণাবলী তাঁর জাতসত্তা থেকে পৃথক কিছু নয়।

আল্লাহর গুণাবলীকে আমরা দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

এক : ইতিবাচক (ثبوتية)

দুই :নেতিবাচক (سلبية)

অথবা

এক : সৌন্দর্যমন্ডিত (جمالية)

দুই : মহিমামন্ডিত (جلالية)

অতএব যদি কোন সিফাত বা গুণ ইতিবাচক হয় আর তা আল্লাহর সারসত্তার জন্যে শোভনীয় ও সৌন্দর্যময় বলে পরিগণিত হয় তা'হলে আমরা তাকে 'জাতগত ইতিবাচক' বা 'সৌন্দর্যমন্ডিত' গুণ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। তাই জ্ঞান, শক্তি ও হায়াত বা জীবন ইতিবাচক গুণের অন্তর্ভুক্ত যা তাঁর পবিত্র সারসত্তার পরিপূর্ণ অস্তিত্বের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে।

আর যখন কোন গুণ দ্বারা আল্লাহ্ থেকে ত্রুটি ও অপূর্ণাঙ্গতা এবং অন্য কিছুর প্রতি মুখোপেক্ষিতা দূরীকরণ বুঝানো হয় তখন সেই গুণকে নেতিবাচক (سلبية) বা মহিমামন্ডিত (جلالية) গুণ বলা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ''দৈহিকসত্তা'', ''স্থান দখল'', ''স্থান পরিবর্তন'' ও ''গতিশীলতা''- র অস্বীকার তাঁর নেতিবাচক গুণাবলীর মধ্যে পরিগণিত।

হিজরী একাদশ শতকের প্রাজ্ঞ দার্শনিক এবং আক্বায়েদ শাস্ত্রের সুবিখ্যাত পন্ডিত সাদরুল আফাযিল মোল্লা সাদরা (রহঃ) উপরোক্ত দু'টি গুণ তথা সৌন্দর্যমন্ডিত গুণ ও মহিমামন্ডিত গুণের বিশ্লেষণ প্রদান করতে গিয়ে নিম্নের আয়াতটি উল্লেখ করেছেন।[২২]

আল্লাহ্ কুরআনুল কারিমে এরশাদ করেছেন :

(تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)

অর্থাৎ : তোমার প্রতিপালকের নাম মহান ও বরকতময়, যিনি মহিমান্বিত (ذِي الْجَلَالِ) এবং সম্মানিত (وَالْإِكْرَامِ) ।(আর- রাহমান, আঃ নং- ৭৮)

১৫

কোরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র গুণাবলী

আল্লাহ্‌ ক্ষমতাবান

আল্লাহ্‌ জ্ঞানী

আল্লাহ্‌ চিরঞ্জীব

আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা

আল্লাহ্‌ প্রজ্ঞাবান

আল্লাহ্‌ ন্যায়বিচারক

আল্লাহ্ জ্ঞানী

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন :

(وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)

অর্থাৎ : তাঁর (আল্লাহর) নিকট সমস্ত অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞানভান্ডার সংরক্ষিত, তিনি ব্যতীত ঐ সব বস্তু সম্পর্কে অন্য কেউ অবহিত নন। ভূ- তলে ও সাগরে যা কিছু আছে সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবগত এবং (বৃক্ষ থেকে) এমন কোন পত্র পতিত হয় না যা আল্লাহর অজানা এবং পৃথিবীর অন্ধকার গর্ভে এমন কোন শষ্য কণা এবং শুষ্ক ও তরল পদার্থ নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে (তাঁর অনন্ত জ্ঞান ভান্ডারে) উল্লেখ করা হয়নি।(আল্ আন্আম, আঃ নং- ৫৯)

আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে অনত্র, আরো বলেন :

(عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)

অর্থাৎ : সকল অদৃশ্য সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ্) পরিজ্ঞাত, যমীন ও আসমান সমুহে এমন কোন বিন্দু কণা নেই, এমন কোন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু নেই যে তাঁর অসীম ও অনন্ত জ্ঞানে সংরক্ষিত হয়নি।(সাবা, আঃ নং- ৩)

আল্লাহ্ ক্ষমতাবান :

পবিত্র আল্ কোরআনে উল্লেখ আছে :

(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

অর্থাৎ : আল্লাহ্ এমন এক সত্তা যিনি সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোর ন্যায় আরো আসমান, যমীন থেকে তৈরী করেছেন। তিনি সাত আসমান ও যমীনের মধ্যে তাঁর বিধি- বিধান অবতীর্ণ করেন যেন সকলেই জানতে পারে যে, অবশ্যই আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (আত্ তালাক, আঃ নং- ১২)

আল্লাহ্ চিরঞ্জীব

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন :

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا)

অর্থাৎ : (হে রাসুল) তুমি চিরঞ্জীব খোদার উপর ভরসা কর এবং তাঁর প্রশংসাসহ গুণকীর্তন কর। (আল্ ফুরক্বান, আঃ নং- ৫৮)

তিনি অনত্র আরো বলেন :

(اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ)

অর্থাৎ : আল্লাহ্ এমন এক সত্তা- যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে কখনো অলসতা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না।(আল্ বাক্বারা, আঃ নং- ২৫৫) □

আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন উল্লেখ করছে :

(وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ)

অর্থাৎ : আল্লাহ্ তোমাদের সকল কথা- বার্তা শ্রবন করে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।(আল্ মুজাদিলাহ্, আঃ নং- ১)

আল্লাহ্ প্রজ্ঞাবান

মহাগ্রন্থ আল্ কোরআনে আল্লাহ্ বলেন :

(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

অর্থাৎ : আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান।(আন্ নিসা, আঃ নং- ২৬)

আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক :

পবিত্র আল্ কোরআনে আল্লাহ্ বলেন,

(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ)

অর্থাৎ : আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং ফেরেস্তা, জ্ঞানী ও বিদ্যান ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন ইলাহ্ নেই যিনি ন্যায়বিচার করে থাকেন।(আল্ ইমরান, আঃ নং- ১৮)

১৬

নাহজুল বালাগ্বা থেকে আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে হযরত আলী বিন আবি তালিবের একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। বিষয়ের গুরুত্বের কারণে নাহজুল বালাগ্বা গ্রন্থে সংকলিত উক্ত বক্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশটুকু হুবহু পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরা হলো :

"সমস্ত প্রশংসা আর গৌরব আল্লাহর- যাঁর গুণ ও গুরুত্ব কোন যুগের কোন বাগ্মীই বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। যাঁর করুণা আর বদান্যতার হিসাব করতে সর্বযুগের হিসেবী আর গণিতজ্ঞরাও হবে ব্যর্থ, শত চেষ্টা করেও তাঁর প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জানানো সম্ভব নয় কারো পক্ষে। যত কঠোর শ্রমই করা হোক না কেন, কেউ- ই বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে না তাঁর অস্তিত্ব ও সত্তা। যুক্তি- বিবেচনা দিয়ে তাঁর নাগাল মিলে না। বুদ্ধি, বোধশক্তি ও বিদ্যার গভীরতা দিয়ও উপলব্ধি করা যায় না আল্লাহর জাতের। মানব মনীষার বোধ, বোধি, উপলব্ধি আর পান্ডিত্য তাঁকে দেখতে অক্ষম। তাঁর সিফাতকে (গুণাবলীকে) করা যায় না নির্দিষ্ট, সীমিত- আর কোন রকম সংজ্ঞায় বাঁধা। পৃথিবীর কোন ভাষায় এমন শব্দ নেই, যা দিয়ে তাঁর সিফাত (গুণাবলী) আর জাত (সারসত্তা) বর্ণনা করা যায়। তিনি চিরন্তন ও চির বিদ্যমান- - - তাই করা যায় না তাঁর সূচনার সময় নির্দেশ বা তাঁর বিদ্যমানতার সময়- সীমা নিরূপণ। বিশ্ব সৃষ্টি, বায়ু মণ্ডলের বিশ্বব্যাপী বিস্তার, তরল মাটি ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে পাহাড় পর্বতে পরিণতি, যা বিশ্ব- দেহে খুটির কাজ করছে - - - এ সবই আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। ধর্মের পথে প্রথম পদক্ষেপ হলো আল্লাহকে স্বীকার করে, বুঝে নিজের প্রভু হিসেবে মেনে নেয়া। বিশ্বাস আর দৃঢ়- স্বীকৃতিতেই নিহিত ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা। সত্যকার বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তা আন্তরিকতার সাথে মেনে নেয়া। তৌহিদে বিশ্বাসের সত্যকার রূপ হচ্ছে- আল্লাহ্ সম্পূর্ণ পাক আর

স্বভাব বা প্রকৃতির ঊর্দ্ধে, তাঁর সাথে যেমন কিছুই যোগ করা যায় না, তেমনি যায় না কিছু বিয়োগ করাও, এমনকি তাঁকে উপলব্ধি করাও।

উপলব্ধি করা চাই যে, আল্লাহর জাত আর তাঁর সিফাত বা গুণাবলীতে কোন পার্থক্য নেই, আর এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করা অন্যায় ও অনুচিত। তাঁর জাত থেকে তাঁর সিফাতকে যে (গুণাবলীকে) পৃথক মনে করে, বুঝতে হবে সে আল্লাহর একত্ব বিসর্জন দিয়ে দ্বিত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে।

এরকম মানুষই আল্লাহর খণ্ড অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এ রকম বিশ্বাস যে পোষণ করে, তার পক্ষে আল্লাহর সত্যকার উপলব্ধি সম্ভব নয়- - - সে অজ্ঞ, সে সব সময় নিজের কোন কাল্পনিক বস্তুকেই দেবতা ভাবতে চেষ্টা করে। যে কেউ এমন বিশ্বাস পোষণ করে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে- - - সে চাইবে তাঁকে স্থানে বা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতায় বা সিফাতে (গুণাবলীতে) আবদ্ধ করে রাখতে। এভাবে সে নিজেই আল্লাহকে নিজের সৃষ্ট বস্তুর সমস্তরে নামিয়ে আনে।

তিনি কোন স্থান বিশেষের গুণে গুণান্বিত এ ধারণা করে সেভাবে তাঁকে নির্দেশ করা অথবা তিনি কোন বিশেষ অবস্থা বা ঘটনায় আবদ্ধ বিশ্বাস করা বা তাঁকে ছাড়াই কোন বিশেষ কাল বা স্থান থাকতে পারে মনে করার অর্থ তাঁর সর্বজ্ঞতা, আর সর্ব উপস্থিতিকেই অস্বীকার করা এবং সে ধারণাকেই রদ্ (বাতিল) করে দেওয়া। এরকম সব ধারণার ফলে আল্লাহর অস্তিত্ব সংখ্যাভিত্তিক ঐক্যে পরিণত হবে (অর্থাৎ সংখ্যার মতো যার যোগ- বিয়োগ ও গুণ- ভাগ চলে)।

আল্লাহর জন্যে স্থান নির্দেশ করা- কোন স্থান বিশেষে বা তার উপরে তিনি আছেন মনে করা, মানে তাঁকে স্থানে সীমিত করা আর স্থান থেকে তাঁকে খাটো করা। আর এতে এও বুঝা যায় যে তাঁকে ছাড়া অর্থাৎ তাঁর চির উপস্থিতি বা অবস্থানের বাইরেও স্থান থাকা সম্ভব।

তাঁর অস্তিত্ব চিরন্তন- কোন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি আর তিনি নন কারো দ্বারা সৃষ্ট। তাঁর অস্তিত্বও আসেনি অনস্তিত্ব থেকে। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গেই তিনি আছেন- - তবে শারীরিক বা দৈহিকভাবে নয়, তিনি সব কিছু থেকে দূরে- - তার মানে দৈহিক দূরত্বে নয় বা তিনি নন্ নির্লিপ্ত কি উদাসীন সব কিছু সম্বন্ধে। তিনি সক্রিয় ও কর্মরত, তবে তার কর্মে কি ক্রিয়ায় দৈহিক কোন অঙ্গ- প্রতঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় না- - প্রয়োজন হয় না কোন যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ারের। দেখার

মত সৃষ্ট বস্তু যখন ছিলো না তখনো তিনি দেখতেন। তিনি এক ও নিঃসঙ্গ - কারণ, তাঁর কোন সঙ্গী নেই, যিনি তাঁকে সঙ্গ দেবেন বা যার সঙ্গের অভাব তিনি বোধ করবেন।

তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই সময় আর একই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। সে সবকে আর তাতে যা কিছু আছে সবই অতি নিখুত আর চমৎকারভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন। কোন রকম দুর্ভাবনা ছাড়াই তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন। পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে তার ফলাফল দেখে, নিজের পরিকল্পনাকে শোধরিয়ে তিনি কিছু করেন নি- প্রয়োজন হয়নি তাঁর তেমন কোন প্রক্রিয়ার। এ জন্যে তাঁর অস্তিত্বকেও করতে হয়নি ক্রিয়াশীল। আগাম কোন পরিকল্পনা করে, সযত্নে তার কার্যকারিতা দেখে নিয়ে তবে বিশেষ কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে হাত দিতে তিনি বাধ্য হননি। অর্থাৎ সে সব মানবীয় প্রক্রিয়া তাঁর হয়নি কোন দরকার ....।”[২৩]

১৭

তক্বদীরে বিশ্বাস

তক্বদীরে বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের সকলের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। বিবেক প্রসূত বিষয়াদির অন্যতম এটি। কিন্তু তক্বদীরের ব্যাপারে বিভ্রান্তমূলক ব্যাখ্যা আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত। তন্মধ্যে একটি হলো, "আমাদের কপালে যা লিখা আছে তাই হবে।" আবার অনেকে বলেন, "গরীব- ধনী, সৎ- অসৎ হওয়া ইত্যাদি সব কিছু প্রথম থেকেই তক্বদীরে লিপিবদ্ধ আছে, তাই আমাদের করার কিছু নেই।"

উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণা- বিশ্বাস একজন মানুষকে সকল প্রকার কর্ম- চাঞ্চল্যতা থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করে। ফলে মানুষ যে কোন প্রচেষ্টা চালানোর পূর্বেই ফলাফল নির্ধারণ করে বসে। এসব কিছুই হচ্ছে তক্বদীর সম্পর্কে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।

কুরআনুল কারিমের সুস্পষ্ট বক্তব্যানুযায়ী তক্বদীরের উপর মুশরিকরাও বিশ্বাস করতো। তবে তারা এও বিশ্বাস করতো যে, তক্বদীরের ফলেই মানুষ তাদের কাজ- কর্মে পরাধীন এবং পূর্ব নির্ধারিত ফলাফলই ভোগ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ)

অর্থাৎ : মুশরিকরা বলে যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন তা'হলে আমরা এবং আমাদের বাপ- দাদারা শিরক করতাম না আর কোন কিছুকে হারাম করতাম না।(আল্ আনআম, আঃ নং- ১৪৮)

আর মহান রাব্বুল আ'লামিন মুশরিকদের আক্বিদার উত্তর দিচ্ছেন এভাবে :

(وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)

অর্থাৎ : যখন তারা কোন মন্দ কাজ করে তখন বলে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের এই কাজে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদের এই কাজে নির্দেশ দিয়েছেন। বল (হে রাসূল) নিশ্চয়ই আল্লাহ

কোন মন্দ কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জান না।(আল আরাফ, আঃ ২৮)

এপ্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) বলেছেন :

“আমার উম্মতের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তারা নিজেদের পাপ কর্মগুলোকে আল্লাহর হুকুম বলে চালিয়ে দেবে। তারা আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন আর আমিও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।”[২৪]

মুসলমানদের ভিতর যারা তক্বদীর ও পূর্ব নির্ধারিত ফয়সালর দোহাই দিয়ে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে তাদেরকে পরাধীনতার শিকলে আটকে রাখতে চায় তাদের মধ্যে আমীর মুয়াবিয়া সর্বপ্রথম। এ প্রসঙ্গে ইবনে কুতাইবা বলেন :

মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার পর যখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বীয় পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দানের উপযোগী মনে করলো তখন আবদুল্লাহ বিন ওমর প্রতিবাদ করলে তিনি বলেছিলেন, মুসলিম উম্মতকে দ্বিধাবিভক্ত করা ও তাদের রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি ইয়াযিদের খেলাফতের বিষয়টা ভাগ্যের লিখন ও ফয়সালা। বৈ কিছু নয়, এতে জনগণের করার কিছু নেই।[২৫]

এর বিপরীতে অনেক কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন, তক্বদীরের উপর বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ তার কাজ- কর্মে কোন স্বাধীনতা রাখে না। ক্বাদা ও ক্বাদার তো মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করে না বরং মানবজাতীর স্বাধীনতার রক্ষাকবচ এই ক্বাদা ও ক্বাদার।

তক্বদীর ও ফয়সালার অর্থ

তক্বদীর ও ফয়সালা শব্দদ্বয় আরবী ভাষায় একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা আল্ ক্বাদা ওয়াল ক্বাদার নামে পরিচিত। যদিও বাংলা ভাষায় এ দু’টো শব্দ তক্বদীর বা ভাগ্য অর্থে বহুল প্রচলিত। তথাপি আরবী পরিভাষায় উক্ত শব্দদ্বয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবধান ও পার্থক্য বিদ্যমান।

তক্বদীরের অর্থ হচ্ছে তাহদীদ বা পরিমাপ ও সীমা নির্ধারণ আর ক্বাদা হচ্ছে হুকুম বা ফয়সালা। এ দু'টোই আবার ...ইলমি বা জ্ঞানগত এবং আইনি বা বাস্তবময় দু'ভাগে বিভক্ত। অতএব, ক্বাদা ও ক্বাদার সর্বমোট চারভাগে বিভক্ত।

(১) জ্ঞানগত ফয়সালা: যদি কোন বস্তু তার অস্তিত্ব লাভের শর্তসমূহ পূরণ করে তাহলে তা অবশ্যই অস্তিত্বমান হবে ...এ সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানকে জ্ঞানগত ফয়সালা বলা হয়ে থাকে।

(২) জ্ঞানগত তক্বদীর : বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে অথবা বস্তুগত সত্তাসমূহের সৃষ্টির পূর্বে প্রতিটি বস্তুর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাপারে আল্লাহর চিরন্তন জ্ঞান ভান্ডারে যে পরিমাপ ও সীমানা নির্ধারিত তাকে জ্ঞানগত তক্বদীর বলা হয়। সুতরাং আল্লাহর রাব্বুল আ'লামীন প্রতিটি বস্তুর সীমারেখা ও পরিমাপ এবং এর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

(৩) বাস্তবময় ফয়সালা : কোন বস্তুর সকল কার্যকারণ সম্পন্ন হয়ে গেলেই তা সত্তাশীল হওয়ার জন্যে অবশ্যম্ভাবী রূপ ধারণ করবে। আর এটাই হল বাস্তবময় ফয়সালা।

(৪) বাস্তবময় তক্বদীর : যখন কোন বস্তু অস্তিত্বশীল হয় তখন সে তার সকল বৈশিষ্ট্য নিয়েই অস্তিত্বে বহিঃপ্রকাশিত হয়। এটাই হচ্ছে বাস্তবময় তক্বদীর।

মূলত : তক্বদীরের অর্থ কখনো এটা হতে পারে না যে, 'দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম থেকেই আমার কপালে লিখা আছে আমি কি গরীব হবো না, ধনী, জ্ঞানী হবো না কি নির্বোধ ইত্যাদি'। তক্বদীরের আভিধানিক অর্থ হলো, 'পরিমাপ'। অর্থাৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রদত্ত একটা পরিমাপ বিরাজমান। ভূ- মন্ডল কিভাবে, কার চতুর্দিকে, বৎসরে কতবার প্রদক্ষিণ করবে এ সকল কিছুর জন্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ বা নিয়ম- নীতি বিদ্যমান। তদ্রূপ মানবজাতির জন্যেও এক সুনির্দিষ্ট আইন ও পরিমাপ নির্ধারিত আছে। মানুষের কপালে গরীব বা ধনী বলে কোন কিছু লিখা নাই। বরং সৃষ্টি জগতের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে যে নির্ধারিত পরিমাপ বিরাজমান তারই নাম 'তক্বদীর'। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ ধরনের পরিমাপ নির্ধারিত যে, 'মানুষ পরিশ্রম অনুযায়ী ফলাফল ভোগ করবে'। অলসতা করে কাজে অবহেলা করলে পরিণতি কি হবে তার পরিমাপ নিশ্চয়ই আছে।

তক্বদীর বা ভাগ্য পরিমাপের অর্থে প্রতিটি প্রাণীর কর্মের দক্ষতা ও একাগ্রতা এবং সময়ের মূল্য ও কর্মের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। সার্বিকতার আলোকে কতকগুলো নিয়ম- নীতির সমষ্টি- ই হচ্ছে তক্বদীর বা ভাগ্য, যদিও আল্লাহর জ্ঞান প্রতিটি প্রাণীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কার্যের ব্যপারেও সুপ্রসারিত। মানুষ তার স্বীয় কর্ম ক্ষমতা বলে নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ণয় করতে সক্ষম। মানুষ ইচ্ছে করলে পৃথিবীতে সুখের নীড় গড়তে পারে আবার আখেরাতের জন্যে শান্তির নিবাসও তৈরী করতে পারে। আবার সে নেতিবাচক কাজ আঞ্জাম দিতে তার স্বাধীনতা ও ইচ্ছা ক্ষমতারও অপব্যবহার করতে পারে। মানুষের ভাগ্য তার নিজের হাতেই।

এ প্রসঙ্গে আল্ কোরআনে আল্লাহ্ বলেনঃ

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষন পর্যন্ত না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়।(সূরা আর রায়াদ, আয়াত নং ১১) ।

১৮

আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী

আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি সর্বত্র বিস্তৃত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তার কাছে অর্থহীন। আল্লাহর জ্ঞান তার জাত- সত্তার সাথে সম্পৃক্ত তবে বহিরাগত কিছু নয়। তিনি জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানী হননি। যেমনি তাঁর জাত- সত্তার কোন সূচনা লগ্ন নেই, তেমনি তাঁর জ্ঞানের আদিকালও নিরূপন করা যায় না। কেননা, তিনি তো কোন বস্তুসর্বস্ব বা শারীরিক সত্তা নন। যখন জ্ঞানের কোন পরিভাষাও সৃষ্টি হয়নি তখনও তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞানী। তিনি আদি- অন্ত সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। সকল কিছুর জ্ঞান তার করায়ত্বে, জ্ঞানের সকল দিক তাঁর সামনেই উপস্থিত। তার জ্ঞান অনন্ত, নির্ভূল, কখনো তার জ্ঞান ভুলের শিকার হয় না। পূর্ব থেকেই সঠিক তথ্য তাঁর কাছে বিদ্যমান।

তবে আল্লাহর জ্ঞান মানব- স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধি ক্ষমতা। কাল ও সময় তারই সৃষ্টি, তাই তাঁর জ্ঞান কোন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর জ্ঞানে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বস্তু, প্রাণী, ঘটনা ও বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই। আমাদের কর্ম- ক্রিয়ার সুক্ষ্মাতিসূক্ষ ব্যাপারও তাঁর গোচরীভূত। তাই বলে তার এ জ্ঞান মানুষের ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার স্বাধীনতাকে সীমিত করে না। আমরা আমাদের কর্ম- ক্ষমতায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং সর্ববিষয়ে আল্লাহর জ্ঞানের কারণে মানুষের ভাল- মন্দ বিবেচনা ও নির্বাচনের স্বাধীনতা কোন ক্রমে খর্ব হয়ে যায় নি।

প্রশ্ন হতে পারে, ‘যদি আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই সমস্ত ব্যাপারে অবগত থাকেন তাহলে মানুষের মন্দ কাজের ব্যাপারেও নিশ্চয়ই তার জ্ঞান আছে। এমতাবস্থায় একজন অসৎ ব্যক্তি কোন অন্যায় ও অনৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে সে কাজটি আঞ্জাম দিতে পারে না। কেননা, আল্লাহ যা জানেন তা তো কোনক্রমে ভুল হতে পারে না। আল্লাহ যদি পূর্ব থেকেই কোন

হত্যাকারীর ব্যাপারে তার অন্যায় হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে সম্যক অবগত থাকেন আর যদি সেই অন্যায় কার্যটি সম্পাদন করা না হয় তা'হলে তো আল্লাহর জ্ঞান ভুল প্রমাণিত হয়ে যাবে। তাই, আল্লাহর জ্ঞান সঠিক প্রমাণ করার জন্যে অবশ্যই উক্ত হত্যাকারীকে এ হত্যাকান্ড ঘটাতে হবে। অতএব এ অন্যায় কাজটি সেই হত্যাকারী লোকটি বাধ্য হয়েই করলো না? কেননা এক্ষেত্রে সে কাজটি করা ছাড়া হত্যাকারী ব্যক্তিটির অন্য কোন উপায় ছিল না। সুতরাং মানুষ যা কিছু করে তা আল্লাহ্- ই করিয়ে থাকেন। মানুষ স্বাধীনভাবে কোন কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয়''।

নিম্নলিখিত উপায়ে অত্যন্ত সহজভাবে আমরা উক্ত প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারি :

প্রথমত : আল্লাহ কোনক্রমে অন্যায় কাজ করতে পারেন না। কেননা, অন্যায় ও অসৎ কাজ সেই করেন যিনি এসব কাজের মাধ্যমে হয়ত নিজের প্রভাব- প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চান নতুবা যিনি একজন ক্রটিপূর্ণ সত্তা, তার দোষ- ক্রটি ঢাকার জন্যে অন্যের উপর যুলুম- অত্যাচারের মত নিকৃষ্ট পথের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কিন্তু একজন অপরিহার্য, অমুখাপেক্ষী ও সুবিচারক সত্তার জন্যে এ ধরণের কল্পধারণা সম্পূর্ণ অশোভনীয়।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর জ্ঞান, মানুষের কাজ- কর্মের স্বাধীনতাকে সীমিত করে না। মানুষ তার স্বীয় বিবেক- বুদ্ধি ও বিবেচনা ক্ষমতা দিয়ে ভাল অথবা মন্দ কাজের নির্বাচন করে থাকে। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিনি শুধু ভাল বা মন্দ কাজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। কে কখন কি ভাবে একটা ভাল অথবা মন্দ কাজ আঞ্জাম দিবে এ ব্যাপারে তার অনন্ত জ্ঞান রয়েছে। আর এ সমস্ত কাজগুলো যে মানুষ তার স্বীয় স্বাধীনতা বলে সম্পাদন করবে - এ বিষয়েও তিনি সম্যক জ্ঞানের অধিকারী। কেননা, আল্লাহ অসীম জ্ঞানের অধিকারী, তার জ্ঞানের পরিধি নিরূপন করা অসম্ভব।

উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন শিক্ষক তার ক্লশের কোন ছাত্রের ব্যাপারে বলেন যে, 'ঐ ছাত্রটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবে'। তাহলে শিক্ষক কি ঐ ছাত্রের লেখাপড়া ও তার প্রথম স্থান অধিকারের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করলেন? কক্ষনো না। আল্লাহর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই

একই বক্তব্য প্রযোজ্য। তিনি জানেন, তাই বলে মানুষের কাজ- কর্মের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না মোটেও। আর যদি আল্লাহ- ই মানুষকে দিয়ে মন্দ ও অন্যায় কাজ করাবেন, সমাজে অবিচারের প্রসার ঘটাবেন তাহলে তিনি কোরআন পাকে কি করে মানবজাতিকে সৎ ও হেদায়েরেত পথে আহ্বান জানাতে পারেন? যে নিজেই অন্যায় কার্য করেন সে কিছুতেই অপর লোকদের ন্যায় পথে আহ্বান জানাতে পারেন না।

অপরদিকে, পরকালে বিশ্বাসীদের জন্যে এ ধরণের অমুলক প্রশ্ন অত্যন্ত বিষ্ময়কর। কেননা, আমরা আমাদের বিবেক প্রসূত দলীলপ্রমাণের সাহায্যে এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য যে, মানুষকে তার ভাল- মন্দ কাজের হিসেব দিতে হবে পরকালে। আর যদি ইহজগতে কোন মানুষের অসৎ কাজের জন্যে আল্লাহ্ দায়ী হয়ে থাকেন তা'হলে তিনি কিভাবে সে ব্যক্তির অন্যায় কাজের শাস্তি দিবেন? কেননা, মন্দ কাজটি তো ঐ ব্যক্তি করেনি বরং আল্লাহ্- ই করিয়েছেন। তারপরও যদি বান্দাকেই শাস্তি ভোগ করতে হয় তাহলে বলতে হয় এক্ষেত্রে আল্লাহ্ মানুষের উপর অবিচার করেছেন (নাঊযুবিল্লাহ্)। সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ বিবেক এধরনের আবিচার আল্লাহর উপর কখনো আরোপ করতে পারে না।

পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় :

(قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)

অর্থাৎ : যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় তারা কখনো সফলকাম হতে পারে না।(ইউনুস, আঃ নং ৬৯)

তাই এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস, 'কোন কিছু থেকে কোন কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহ্ থেকে হয়'। মানুষকে সত্য পথে দিক নির্দেশনার পরিবর্তে ভ্রান্ত পথে ধাবিত করে অনায়াসে। যারা এ ধরণের ভ্রান্ত আক্বিদায় বিশ্বাসী তারা মুসলমান বলে দাবী করলেও হয় তারা পরকালে অবিশ্বাসী নতুবা আল্লাহকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে নিজেদের ঈমানের অপরিপক্কতারই সাক্ষ্য দিতে সচেষ্ট। তারা ঈমানের বেশভূষা পরিধান করলেও প্রকৃত ঈমানের স্বাধ আস্বাদন করতে পারেননি।

সুতরাং যেহেতু মন্দ কাজের জন্য মানুষ স্বয়ং দায়ী তাই ঐ মন্দ কাজের শাস্তিও তাকেই ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ মানুষের হেদায়াতের জন্যে নবী- রাসূল পাঠিয়েছেন। মানুষ তার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বীয় স্বাধীনতা ও বিবেক- বিবেচনা প্রয়োগে সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৯

স্বাধীনতা বনাম পরাধীনতা

যারা বিশ্বাস করেন, 'মানুষের সকল ভাল- মন্দ কাজের মূলে আল্লাহর শক্তিমত্তা কাজ করছে এবং সকল কিছুর স্রষ্টাও তিনি'- তারা তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করে থাকেন। আল্লাহ্ বলেন,

(إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর শক্তিমান।(আল বাকারা, আ : নং ১০৯)

তিনি আরো বলেন,

(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)

অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্যে যমিনের বুকে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।(আল বাকারা, আ : নং ২৯)

তারা উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে ব্যাখ্যায় মানুষের সকল মন্দ বা অমঙ্গল কাজগুলোকেও আল্লাহর কাজ বলে চালিয়ে দিতে চান। তারা এ ধরনের আয়াতের অর্থ সমুন্নত রাখতে গিয়ে আল্লাহর ন্যায়বিচার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পরকালের হিসাব নিকাশকেও প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছেন। কেননা, যে আল্লাহ্ নিজে মন্দ বা অমঙ্গল কাজ করেন সে আল্লাহ্ কি করে মানুষের মন্দ কাজের বিচার করবেন? আর যদি মানুষের মন্দ কাজের জন্যে তিনি নিজেই দায়ী হন তাহলে তার মন্দ কাজের জন্যে তিনি মানুষকে কি করে শাস্তি প্রদান করতে পারেন? আর এভাবেই পরকালের বিচার দিবসে হিসাব নিকাশ অর্থহীন হয়ে পড়বে। আশআরী মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ এ ধরণের ভিত্তিহীন ও পক্ষপাতিত্ব বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামকে বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তি- বিরোধী একটা মতবাদে রূপান্তরিত করে ফেলেছেন।

অপরদিকে, মু'তাযিলা অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন, মানুষ সম্পূর্ণ ও নিরংকুশ স্বাধীন। আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করে ছেড়ে দিয়েছেন। মানুষ ভাল- মন্দ যা কিছু ইচ্ছে স্বাধীনভাবে তা

আঞ্জাম দিতে সক্ষম। এতে আল্লাহর কোন হস্তক্ষেপ নেই। আল্লাহ্ শুধু বসে তামাশা দেখছেন, মানুষ কি করছে। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে সকল কিছুর দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তারা তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে আল্লাহর সুবিচার ও প্রজ্ঞার বিষয়টি উপস্থাপন করে থাকেন। মু'তাযিলিরা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের ন্যায় কোরআনের যতস্থানে আল্লাহর ন্যায়বিচার, অন্যায় কার্য পরিহার ও তার প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোকে তাদের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করে থাকেন।

এক : . (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।(আত তাওবা, আয়াত নং ২৮)

দুই : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের উপর কোন প্রকার যুলুম- অত্যাচার করেন না বরং মানুষই নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করে থাকে।(ইউনুস, আয়াত নং ৪৪)

তারা বলে, যদি আল্লাহ কোন মন্দ কাজ করেন অথবা মন্দ কাজে মানুষের সাথে অংশ গ্রহণ করেন তাহলে তিনি সুবিচারকের মহান পদ থেকে অপসারিত হয়ে যাবেন। কিন্তু কোরআন ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত যে আল্লাহ একজন ন্যায় বিচারক ও আদেল। তারা আল্লাহর ন্যায়বিচারের গুণকে সমুন্নত রাখতে গিয়ে আল্লাহর শক্তিমত্তাকে সীমিত করে ফেলেছেন যা আশআরী চিন্তাভাবনার চেয়েও অত্যন্ত বিপদজনক। এটা নির্ঘাত সত্য যে, বিশ্বজগতের সকল কিছু আল্লাহ্ তার স্বীয় কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। কোন কিছুই তাঁর শক্তিমত্তার বাইরে নয়। সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনি। কিন্তু মানুষের কর্মকান্ড ও অন্যান্য প্রাণীদের কর্ম- ধারা একই রকম নয়। সৃষ্টি জগতের সকল কিছুই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ম- নীতি মোতাবেক কার্য সম্পাদন করে থাকে, এমন কি মানবজাতিও। আকাশ- বাতাস, পাহাড় পর্বত, গ্রহ- নক্ষত্র ইত্যাদি সকল সৃষ্ট বস্তু আল্লাহর নির্দেশের অনুগত। এক্ষেত্রে মানুষও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু মানুষের কর্ম- ধারার সাথে অন্যান্য সৃষ্টির কর্ম- পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে। অনেকে ভুলবশতঃ সবকিছুকে একই পদ্ধতি ও নিয়ম- ধারার মধ্যে সংমিশ্রণ করে অন্যান্য সৃষ্টি

বস্তুসমূহের সাথে মানুষের তুলনা করে থাকেন। ফলে আল্ কোরআনে যেখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন'। অথবা 'আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান'। সেখানে তারা এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পষ্ট বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে গেছেন। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হচেছ, 'কোন রকম বিবেক- বুদ্ধি ছাড়াই নির্দেশ মেনে চলতে হবে'। আর মানবজাতীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে : 'সকল কাজ- কর্ম বিবেকের বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে সম্পন্ন করতে হবে'। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ করে চলেছে মানবকুল। তবে যেহেতু সে ভাল- মন্দ বিচার করার ক্ষমতা রাখে এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে থাকে, তাই তার কর্মের ফলাফলও তাকেই ভোগ করতে হবে।

পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আশআরী ও তার অনুসারীদের ন্যায় মানুষকে তার ক্রিয়া- কর্মে পরাধীন মনে করা যেমনি যথার্থ বলে পরিগণিত হতে পারে না তেমনি মু'তাযিলীদের মত আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করাও অন্যায় ও অমার্জনীয় অপরাধ বলে পরিগণিত।

এক দিকে আশআরীগণ মানুষকে এমনভাবে খাঁচাবদ্ধ করে ফেলেছে যে, তাদের মতে মানুষ স্বেচ্ছায় কোন কাজই আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে মু'তাযিলীরা মানুষকে এমনভাবে স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা প্রদান করেছে যে তাদের বক্তব্য মতে আল্লাহ্ সকল ক্ষমতা মানুষের উপর অর্পন করে তিনি হাত গুটিয়ে বসে আছেন। এ উভয় মতামত- ই বিভ্রান্তির শিকার।

উপরোক্ত দু'টি মতামতের মাঝামাঝি আরেকটি মতামত বিদ্যমান যা সত্যের মাপকাঁঠিতে সঠিক ও যথার্থ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে বুদ্ধিমান ও চিন্তাবিদদের মাঝে। তা'হলো একদিকে আমরা বলতে পারি মানুষের কর্ম ক্ষমতার পেছনে মূল শক্তিমত্তা হিসেবে আল্লাহ্- ই কাজ করেন। কেননা আল্লাহ্- ই তো আমাদেরকে শক্তি- সামর্থ্য, বিবেক- বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে আল্লাহকে মানুষের মন্দ কাজের জন্যে দায়ী করা যাবে না। কেননা মানুষ তার কাজ-

কর্ম স্বেচ্ছায় আঞ্জাম দিয়ে থাকে, কারো চাপের মুখে নয়। তাই তো এ বিবেক ও বিচার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র নির্বিশেষে মানবতার জন্যে অসংখ্য খেদমত করে যেতে পারে আবার বিপরীতভাবে অপরিসীম অমঙ্গল অন্যায় ও অকল্যাণ কাজ আঞ্জাম দিয়ে যেতে পারে। তাই পূণ্য ও মন্দ উভয় প্রকার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পুরস্কার অথবা শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। আর এ ধরনের তৃতীয় একটি মধ্যপন্থী মতবাদের মাধ্যমেই পরকালে বিশ্বাস, আল্লাহর ন্যায় বিচার ও তার সর্বময় ক্ষমতার গুণাবলী স্ব- স্থানে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এ সম্পর্কে নবী (সাঃ) বংশের ষষ্ঠ পুরুষ ইমাম জা'ফর বিন মুহাম্মদ আস্ সাদেক বলেছেন,

''বাধ্যবাধকতাও নয়, নিরংকুশ স্বাধীনতাও নয় বরং এ দু'টোর মাঝামাঝি একটি অবস্থা- ই হচেছ সঠিক।''[২৬]

২০

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অসীম ক্ষমতাধর প্রভু তিনি। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতার পরিমাপ করা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। তিনি পরম পরাক্রমশালী। অপারগতা তাঁর সত্তা থেকে বহুদূরে। সকল কিছুই তাঁর জন্যে সম্ভব। তবে বস্তুর গুণগত অপারগতা ও সসীমতার কারণে সে বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বের অনুপস্থিতি আল্লাহর অপারগতা প্রমাণ করে না। যেমন ধরুন, কেউ যদি বলে, আল্লাহ কি সমস্ত পৃথিবীকে একটা মুরগীর ডিমের ভিতর স্থাপন করতে পারবেন যে ডিমের আয়তনও বড় হবে না আবার পৃথিবীও আয়তনে ক্ষুদ্র হবে না? এর উত্তরে বলতে হয়, আল্লাহর জন্যে সব কিছু সম্ভব। আমাদের ধারণা মতে এর চেয়েও বৃহৎ ও কঠিন বলে স্বীকৃত যত কিছু হতে পারে, তারও অস্তিত্ব লাভ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনরূপ কঠিন কাজ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলোঃ ডিমের কি পৃথিবী ধারণ করার ক্ষমতা আছে? আর পৃথিবী কি তার স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে ডিমের ন্যায় কোন ক্ষুদ্র আকৃতির বস্তুর ভিতর প্রবেশ ক্ষমতা রাখে? এ সবই হচ্ছে ডিম বা পৃথিবীর গুণগত অপারগতা। দার্শনিক নীতি অনুসারে কোন বস্তুর অস্তিত্বে আগমণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্মিলিত না হলে কখনো ঐ বস্তু অস্তিত্বমান হতে পারে না। দর্শনের পরিভাষায় এ ধরনের বস্তুকে অসম্ভব বস্তুগত সত্তা বলা হয়। মহান আল্লাহ্ এ ধরণের কোন অসম্ভব বস্তুগত সত্তার সৃষ্টি করতে পারেন না।

প্রশ্ন হতে পারে, 'আল্লাহ কি অন্য আরেকটি আল্লাহ সৃষ্টি করতে পারেন?' মূলত : এ ধরণের প্রশ্নের অবতারণা বিভিন্ন ভুল চিন্তা- চেতনা থেকে করা হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রশ্নই ভুল। আল্লাহর জন্যে কোন কিছু অসম্ভব নয়। তবে অসম্ভব বস্তুর সৃষ্টিহীনতার জন্যে ঐ বস্তুর সত্তাহীনতাই দায়ী। এতে আল্লাহর শক্তির মান ও পরিমাপের স্বল্পতা প্রামাণিত হয় না। যেমন ধরুন আপনি একজন বিখ্যাত চিত্রকরকে অনুরোধ করলেন বঙ্গোপসাগরের মাঝে পানির

উপরিভাগে একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় চিত্র অংকন করে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্পী ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই বলবেন, 'এটা একটা অসম্ভব কাজ।' তাহলে 'আপনি চিত্র অংকন করতে পারেন না।' কথাটি ব্যক্ত করতে পারবেন? আপনার উপলব্ধি ক্ষমতা নিশ্চয়ই এধরণের বক্তব্যে সায় দিবে না। আর তখন যদি আপনি ভাবেন, তিনি একজন মিথ্যাবাদী, তাহলে আপনার ধারণা কি সঠিক হবে? চিত্র অংকনের সকল অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও উপকরণ প্রস্তুত থাকার পরও ভদ্রলোকটি কেন পানির উপরে ছবি অংকন করতে পারলেন না? এটা কি তার অপারগতা বলে আপনি চিহ্নিত করতে পারেন? কখনো কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ধরণের অপবাদ দিতে পারে না। আসলে বিষয়টি হচ্ছে, চিত্র ধারণ ক্ষমতা পানির নেই। পানির পক্ষে কোন চিত্র তার বুকে ধারণ করে রাখা অসম্ভব। এটি পানিরই অযোগ্যতা ও অপারগতা। এর জন্যে চিত্রকরকে কোনক্রমে দায়ী করা যাবে না।

তদ্রূপ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ও সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু কোন বস্তুর সত্তাহীনতা ও সম্ভাব্য বস্তুতে পরিণত হতে অপারগতা এবং অসম্ভাব্য অস্তিত্বে পরিণত হওয়া থেকে আল্লাহর অক্ষমতা ও অযোগ্যতার পরিচয় ফুটে উঠেনা কিছুতেই।

পবিত্র আল্ কোরআনে আল্লাহ বলেন,

(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا)

অর্থাৎ, পৃথিবী ও আসমানসমূহে কোন কিছুই আল্লাহর জন্যে অসম্ভব নয়। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।(ফাতের, আয়াত নং ৪৪)

আল্লাহ যদি অন্য কোন আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন তাহলে তিনি (কাল্পনিক দ্বিতীয় আল্লাহ্) তো সৃষ্টি বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবেন। কেননা, তার অস্তিত্ব অর্জনে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে। অতএব, এই সৃষ্টি সত্তা (দ্বিতীয় কাল্পনিক আল্লাহ) স্রষ্টার আসন থেকে পদচ্যুত হয়ে পড়বেন। কারণ, আমরা এমন এক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী যিনি স্বয়ংসৃষ্ট ও অপরিহার্য সত্তা। সত্তাহীনতা তার জন্যে কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং এ ধরণের কাল্পনিক অস্তিত্বের সৃষ্টি, সৃষ্ট বস্তুরই নামান্তর আর তা কক্ষনো আল্লাহ্ হতে পারে না।

২১

ভাল- মন্দের সঠিক অবস্থান

সর্বজনবিদিত সত্য কথা : "আল্লাহ্ যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন"- এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

একটি হলো : "আল্লাহ্ যে কাজই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন তাই ভাল কাজ হিসেবে পরিগণিত, যদিওবা সে কাজটি বিবেকপ্রসূত মন্দকাজ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।"

অপরটি হলো : "আল্লাহ্ কোন মন্দকাজ আঞ্জাম দিতে পারেন না। তিনি শুধু ভাল কাজই করেন।" এখান থেকেই ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় দু'টি মতবাদ তৈরী হয়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে, যা একটি অপরটির বিপরীত। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, আল্লাহর সকল কাজই ভাল কাজ। কিন্তু মতভেদ হচ্ছে এ নিয়ে যে, "মানুষ ধর্মের বিধিনিষেধের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বাধীন বিবেক- বুদ্ধি দিয়ে ভাল- মন্দের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এবং এর পার্থক্য নিরূপণ করতে কি সক্ষম?

এটা স্মরণ রাখা দরকার যে আল্লাহর সকল কাজ তার মহাপ্রজ্ঞা ক্ষমতা দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই আল্লাহর কোন কাজই অকারণে সংঘটিত হয় না, প্রতিটি কাজের পেছনে একটি নির্দিষ্ট কার্যকারণ নির্ধারিত থাকে। আমাদের বিবেক ও বুদ্ধি ক্ষমতাও যেহেতু মহান আল্লাহর সৃষ্টি, তাই এর স্বাভাবিক কাজ হচ্ছে ভাল- মন্দ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে বিচার ক্ষমতার প্রয়োগে যথার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

এর বিপরীতে আশআরী মতাবলম্বীরা বিবেক- বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা- চেতনার মাধ্যমে মানুষের জন্যে ভাল- মন্দের জ্ঞানকে অস্বীকার করে থাকেন। তারা বলেন, ধর্মীয় বিধি- বিধান আগমনের পূর্বে মানুষ কোন বিষয়ের ভাল- মন্দ ধারণা অর্জন করতে পারে না। ধর্ম যা আদেশ করেছে তাই

হচ্ছে ভাল কাজ আর ধর্মের সকল নিষিদ্ধ কাজই হচ্ছে মন্দ কাজ। মুলতঃ ভাল- মন্দের ধারণা ধর্মীয় বিধি- বিধান থেকেই প্রসূত।

প্রকৃত পক্ষে যদি আমরা ভাল মন্দের ধারণাকে ধর্মের বিধি- বিধান ও নিয়মাবলীর মাধ্যমে অক্টোপাসের মত আবদ্ধ করে ফেলি তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যেখানে ধর্মের কোন আলো- বাতাস পৌঁছেনি, যেখানকার জনগণ ধর্মীয় বিধি- নিষেধের কোন ছোঁয়া পায়নি তারা কি ভাল- মন্দ অনুধাবনের ক্ষমতা রাখে না? তারা কি ভাল কাজ করা আর মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার অধিকার রাখে না? এসব প্রশ্নের উত্তরে যদি আশআরীগণ বলেন, তাদের ভাল- মন্দ অনুধাবন করার ক্ষমতা নেই তাহলে তারা বাস্তবতাকেই উপেক্ষা করেছেন। আর যদি বলেন, তারা ভাল- মন্দের কোন কাজ নির্বাচন করার অধিকার রাখেন না তাহলে বলতে হবে তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাধীনতার উপর খবরদারী করেছেন। আর আশআরীদের মতে এ ধরনের জনগোষ্ঠির হিসাব- নিকাশ হবে কিভাবে পরকালে, কিয়ামতের ময়দানে? আশআরী মতাবলম্বীরা এ সব প্রশ্নের উত্তর দানে সম্পূর্ণ অপারগ।

মূলত : আল্লাহ্ সকল মানুষকে সমানভাবে ভাল- মন্দের বিচার ক্ষমতা দান করেছেন। যেখানে ধর্মের বিধি- বিধান অবতীর্ণ হয়নি অথবা পৌঁছেনি তাদের হিসাব- নিকাশ তাদের বিবেকের কাছে থেকেই নেয়া হবে কিয়ামতের দিবসে। এ ব্যাপারে আবুল হাসান মুসা বিন জা'ফার (তাঁর উপর আল্লাহর অফুরন্ত শান্তি বর্ষিত হোক) ---- এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :

"হে হিশাম, নিশ্চয়ই মানুষের জন্যে আল্লাহর দুটি হুজ্জাত বা অকাট্য দলিল রয়েছে। একটি হচ্ছে জাহেরী বা প্রকাশ্য হুজ্জাত অপরটি বাতেনী বা অপ্রকাশ্য হুজ্জাত। জাহেরী হুজ্জাত হচ্ছে রাসুল, আম্বীয়া, ও ইমামগণ আর বাতেনী হুজ্জাত হচ্ছে আক্বাল বা বিচার বুদ্ধি।"[২৭]

প্রকাশ্য হুজ্জাত যেমনিভাবে মানুষকে ভাল কাজের দিকে দেহায়েত করেন তেমনি অপ্রকাশ্য তথা গুপ্ত হুজ্জাতও মানবজাতিকে সৎ ও ন্যায়ের দিকে পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

ভাল কাজের কতগুলো উদাহরণ হচ্ছে : সুবিচার করা, ন্যায্য অধিকার দান ইত্যাদি। আর মন্দ কাজ যেমনঃ অবিচার করা, অন্যায়ভাবে অধিকার হরণ ইত্যাদি। ভাল কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভাল আর মন্দ তার নিন্দনীয় কাজের জন্যে মন্দ। ধর্মীয় বিধি- বিধান এসে ভাল কাজকে ভাল করতে পারে না, বরং পূর্বে থেকেই ভাল। সকল ভাল কাজই ধর্মের অনুকূলে। অপরদিকে মন্দ কাজ শুধু শরিয়তের আইন প্রণয়নের কারণে তা মন্দ হয়ে যায় না, বরং পূর্বে থেকেই আপন বৈশিষ্ট্যবলে মন্দ কাজ হিসেবে পরিগণিত। ধর্মীয় অনুশাসন কখনো ভাল কাজকে মন্দ আর মন্দ কাজকে ভাল বলে ঘোষণা দিতে পারে না। কেননা বিবেক বিরোধী কোন কাজই ধর্মীয় নীতিমালায় স্থান পায় না। আল্লাহ্ স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও মহা- বিবেকবান। মানুষের বিবেকবুদ্ধিও তারই সৃষ্টি। তাই বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্কুলুষ ভাবে সত্য- মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম।

স্মরণীয় যে, আমাদের ভাল- মন্দের আলোচনা ঐ সব ক্রিয়া- কর্ম নিয়ে আবৃত যারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং জাতসত্তাগত দৃষ্টিকোন থেকে ভাল অথবা মন্দ। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুবিচার অথবা অত্যাচার- যুলুম ইত্যাদি ধরা যেতে পারে। আমাদের আলোচনা এমন সব ভাল- মন্দের গুণগত মান নিয়ে ব্যাপৃত যেগুলো চিরন্তন ও শাশ্বত, যেগুলো ভাল- মন্দের আবরণ পরিধান করে স্থান কাল পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীল নয়। এর বিপরীতে এমন সব ভাল বা মন্দ কাজ পৃথিবীতে বিদ্যমান যা ভালমন্দের আবরণে নিজেকে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন সময়ে বা ক্ষেত্রে আবরণ পরিবর্তন করে থাকে। যেমনঃ সত্যবাদীতা, মিথ্যা বলা, অথবা সম্মান বা অসম্মান করা। এটা কখনো কেউ ব্যক্ত করতে পারবে না যে, সব সময় সত্য কথা বলা ভাল কাজ। কখনো সত্য কথা বলা একটা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। যে সত্য কথা বলার কারণে কোন মানুষ বা সমাজের ক্ষতি হতে পারে তা কখনো বিবেকবান মানুষের কাছে ভাল বলে গণ্য হতে পারে না। তদ্রূপ মিথ্যা সব সময় মন্দ কাজ বলে পরিগণিত নয়। বরং কাউকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে মিথ্যা বলাটা একটা ভাল কাজ বলে পরিগণিত হতে পারে। একইরকমভাবে সম্মান করা সর্বদা সর্বস্থানে ভাল কাজ হতে পারে না। বরং কোন অত্যাচারী শাসককে সম্মান প্রদর্শন করা একটা অমার্জনীয় অপরাধ।

আবার এমন কতগুলো ভাল বা মন্দ কাজ বিদ্যমান যে, সেগুলো যে পাত্রে ধারণ করা হয় সে পাত্রের আকার ধারণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেত্রাঘাত করা। যখন কাউকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্যে বেত্রাঘাত করা হয় তখন এ কাজটি একটি ভাল কাজ হিসেবে গণ্য। আবার যখন কাউকে অত্যাচার ও বিরক্ত করার জন্যে বেত্রাঘাত করা হয় তখন এ কাজটি একটি অন্যায় কাজ বলে পরিগণিত হয়। সুতরাং চিরন্তন, শাশ্বত ও স্বভাবগত ভাল বা মন্দের বিপরীতে উপরোল্লেখিত পরিবর্তনশীল ভাল- মন্দের আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত।

২২

আল্লাহর ন্যায়বিচার

ন্যায়বিচারের আরাবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'আদল'। আদল - এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে যুলুম বা অত্যাচার। আদল এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। তন্মধ্যে চারটি অর্থ উল্লেখযোগ্য।

এক : ভারসাম্য রক্ষা।

দুই : সাম্য বা সমান বিচার।

তিন : সকলকে প্রাপ্য অধিকার দান।

চার : পাত্র হিসেবে করুণা বর্ষণ।

উপরোক্ত চারটি অর্থের চতুর্থ প্রকার আদালত বা ন্যায়বিচারের অর্থ অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিক ও প্রজ্ঞাবিদগণ গ্রহণ করেছেন। উক্ত চার প্রকার আদল এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং এর উপর প্রতিবাদী বক্তব্য সম্পর্কে বিভিন্নমুখী বিস্তারিত আলোচনার অবতরণা করা হয়েছে এ বিষয়ের উপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে। তাই সংক্ষিপ্ততার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছি।

আল্লাহর করুণা বিশ্বের প্রতিটি বস্তু ও ব্যক্তির উপর সমানভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কাউকে তার করুণা বা রহমত থেকে বঞ্চিত করেন না। এ বিশ্ব ব্যবস্থায় যেহেতু আদিসত্তা থেকে রহমত গ্রহণের যোগ্যতার পার্থক্য বিরাজমান তাই প্রত্যেকে তাঁর করুণা থেকে তাদের ধারণ ক্ষমতা হিসেবে উপকৃত হয়ে থাকে। এ বিশ্বজগতের কোথাও কোন বৈসম্যতার চিহ্ন নেই। যা কিছু আমরা বৈসম্যতা বলে মনে করি তা সৃষ্টি বস্তুসমুহের মাঝে তাদের ধারণ ক্ষমতার পার্থক্যেরই কারণ। যেমন চলন্ত কোন জাহাজের যাত্রীদের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে সমুদ্র থেকে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে উত্তোলনকারী পাত্রের ধারণ ক্ষমতা হিসেবেই উত্তোলন করা সম্ভবপর হয়ে থাকে, যদিও সমুদ্রের পানির কোন অভাব নেই। আর তাই পানি ধারণকৃত পাত্রের পার্থক্য

হওয়ার কারণে পানির পরিমাণও পার্থক্য হয়ে যায়। বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহর ন্যায়বিচার ব্যবস্থার বিষয়টিও হচ্ছে এ রকম। আমরা পূর্বের আলোচনায় প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহর দ্বারা কোন মন্দ কাজ সম্পাদন হতে পারে না। যেহেতু জুলুম একটি মন্দ কাজ তাই বিবেকবান আল্লাহ্- - - - যিনি আমাদের সকলের বিবেকের সৃষ্টিকারক, তিনি কখনও কোন মন্দ কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন না। কেননা তিনি একজন স্বয়ংসৃষ্ট ও প্রজ্ঞাবান সত্তা। তাঁর জন্যে কোন মন্দ কাজ করা আমাদের কল্পনারও বহির্ভূত বিষয়। তিনি সর্বদা ন্যায়বিচার করে থাকেন।

মহান আল্লাহ্ তাঁর সকল কর্ম পরিপূর্ণ সুবিচারের সাথে সম্পন্ন করে থাকেন আর তাঁর সুবিচার তাঁর চিরন্তন ও শাশ্বত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই তাঁর কাজে কোন ত্রুটি ও খুঁত লক্ষ্য করা যাবে না।[২৮]

এ প্রসঙ্গে আল্ কোরআনে আল্লাহ্ বলেন,

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا)

অর্থাৎ : আমরা ক্বিয়ামাতের দিবসে ন্যায় ও সাম্যের দাড়ি পাল্লা স্থাপন করবো, সেখানে কারো উপর কোন প্রকার যুলুম বা অবিচার করা হবে না।(আল্ আম্বিয়া, আয়াত নং- ৪৭।)

২৩

ক্ষেত্রভেদে আল্লাহর ন্যায়বিচার

এ অধ্যায়ে আমরা আল্লাহর ন্যায়বিচারের তিনটি ক্ষেত্র উল্লেখ করছি মাত্র।

এক : আল্লাহ্ তাঁর স্বরচিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষের উপর অবিচার করেন না। অর্থাৎ মানুষের সাধ্যের অতীত তিনি কর্তব্য চাপিয়ে দেন না। মানবজাতির সামর্থের বাইরের কোন আইন তিনি রচনা করেন নি।

এ বিষয়ে আল কোরআন উল্লেখ করছে :

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

অর্থাৎ : আল্লাহ্ সাধ্যের অতীত কারো উপর কর্তব্য চাপিয়ে দেন না।(আল্ বাক্বারা, আয়াত নং- ২৮৬)

দুই : পরকালে প্রতিদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ কারো উপর কোন প্রকার অবিচার করবেন না। তিনি সুবিচারের সাথে মানুষকে তার প্রাপ্য পুরস্কার অথবা শাস্তি দান করবেন। সেদিন তারা তাদের নিজ নিজ কর্মের ফলাফল ভোগ করবেন।

আল্ কোরআনে আল্লাহ্ বলেন :

(فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

অর্থাৎ : আল্লাহ্ তাদের উপর কোন যুলুম করবেন না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করেছেন।(আর রুম, আয়াত নং- ৯)

তিন : সমস্ত সৃষ্টিজগত জুড়ে ন্যায়বিচার বিরাজমান অর্থাৎ সকল জীব ও জড় বস্তুকে আল্লাহ্ নিখুঁত, সুসামঞ্জস্য, ভারসাম্য ও সুশৃঙ্খল- সুবিন্যাস্তভাবে সৃষ্টি করেছেন, কোথাও কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে না। সকল কিছুই স্ব- স্ব স্থানে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সাথে বিরাজমান। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বিশ্বের সকল কিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করছেন :

(إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ)

অর্থাৎ : এই যে দিবা- রাত্রির পরিবর্তন এবং আসমান সমুহ ও যমীনে যা কিছু আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয়ই তাতে মোত্তাক্বীনদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।(ইউনুস, আয়াত নং- ৬)

২৪

সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই অমঙ্গল নয়

কখনো এ বিশ্ব জগতে এমন সব ঘটনা ঘটে যা দেখে মানুষ চমকিয়ে উঠে। মনে সাংঘাতিকভাবে ব্যথা পায় সে। মানব দরদী মন আত্মবেদনায় ভরে ওঠে তখন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভূমিকম্প, প্লাবন, ঝড়, তুফান, খরা, রোদ্রের প্রখর উত্তাপ ইত্যাদি। এগুলোর কারণে প্রতি বৎসর শত সহস্র লোক প্রাণ হারায়। সন্তান শুন্য হয়ে যায় কত মায়ের কোল। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ন্যায়বিচারক আল্লাহর বান্দাদের উপর এগুলো কি অত্যাচার নয়? কেননা এগুলো তো সব অমঙ্গল জিনিষ। মানুষের জীবনের ক্ষয়ক্ষতি কি করে মঙ্গলজনক কাজ বলে পরিগণিত হতে পারে?

এ সব প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে যুগে যুগে মানুষ বিভিন্ন মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। অনেকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর না পেয়ে 'দ্বিত্ববাদের' শিকলে আটকা পড়েছে। তারা ভাল ও মন্দ কাজের জন্যে পৃথক পৃথক দু'টি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

বস্তুতঃ সৃষ্টি জগতের ঘটনাসমুহকে আমরা ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখি বলেই মনে হয় এগুলো অমঙ্গল ও ক্ষতিকর। বিশ্ব সৃষ্টিতে কোন কিছুই দুর্ঘটনাক্রমে আবির্ভূত হয় না। এগুলোর পেছনে নিশ্চয়ই কোন সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ বিদ্যমান।

প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল বলতে পৃথিবীতে কোন কিছু নেই। আল্লাহর এ প্রকৃতিতে অমঙ্গল কোন ঘটনাই ঘটে না বরং আমরা যখন কোন ঘটনাকে আমাদের স্বার্থের সাথে তুলনা করি তখনই মনে হয় এটি একটি অমঙ্গল জিনিষ বা ঘটনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন কোন বিষাক্ত প্রাণী যেমন সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি অবলোকন করি তখন মনে হয় এগুলো শুধু মানুষের অনিষ্টই করে, বাস্তবে কিন্তু তা নয়। বস্তুতঃ এ ধরনের মন্তব্য, সৃষ্টি বস্তু ও সৃষ্টি জগতের প্রাকৃতিক তথাকথিত দুর্যোগগুলোকে মানুষের অবস্থার সাথে তুলনা করার কারণেই হয়ে থাকে। কিন্তু অনস্বীকার্য সত্য

যে উক্ত প্রাণীগুলোর এবং তদ্রূপ আপাতঃ দৃষ্টিতে ক্ষতিকর প্রাণী বা ঘটনাগুলো তাদের স্ব-স্ব অবস্থানে অত্যন্ত মঙ্গলময়। তাদের অস্তিত্ব অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা ছাড়া নিশ্চয়ই স্ব-স্ব স্থানে তারা অত্যন্ত উপযোগী। সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে অমঙ্গল ও অনিষ্ট সব জিনিষ বা ঘটনাই হলো তুলনামূলকভাবে মন্দ। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি জগতের সব কিছুই স্ব-স্ব স্থানে অত্যন্ত সৌন্দর্যময়।

এটা নির্ভেজাল সত্য কথা যে, পৃথিবীতে অমঙ্গল বা অনিষ্ট ঘটনার কোন অস্তিত্ব নেই। দর্শনের পরিভাষায় এ সব অমঙ্গল ঘটনা বা বস্তু হচ্ছে অনস্তিত্বশীল সত্তা। উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরা প্রয়োজন বলে মনে করছি। ধরুণ আপনাকে যদি বলা হয় মুর্খতা ও অজ্ঞতার কোন অস্তিত্ব আছে কি? উত্তরে নিশ্চয়ই বলবেন, "সত্য কথা হলো, এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই"। যেহেতু মুর্খতা ও অজ্ঞতার বিপরীত শব্দ হলো জ্ঞান বা ইলম তাই যেখানেই জ্ঞানের অস্তিত্ব অবর্তমান সেখানেই মুর্খতা ও অজ্ঞতা চলে আসে। এক কথায় মুর্খতা ও অজ্ঞতার অর্থ হলো জ্ঞানহীনতা।

ঠিক অনুরূপভাবে অমঙ্গল কোন জিনিষের অস্তিত্ব এ বিশ্বে নেই। অমঙ্গল বা অনিষ্টতার অর্থ হচ্ছে মঙ্গলহীনতা অর্থাৎ যেখানে অমঙ্গলের অস্তিত্ব নেই। আর এ কারণেই অমঙ্গল বা অনিষ্টতাকে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ে দার্শনিক ও কালাম শাস্ত্রের দৃষ্টিকোন থেকে পরিপূর্ণ আলোচনা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বিধায় বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকছি। আশা করি বুদ্ধিমান পাঠক মহল এ বিষয়ে যৎসামান্য আলোচনা থেকেই যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবেন। তাই সংক্ষিপ্ততার প্রতি দৃষ্টি রেখে বিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টোটলের একটি প্রসিদ্ধ বক্তব্য উল্লেখ করেই এ বিষয়ে ইতি টানছি। তিনি বলেছেন, "প্রকৃতির সকল সম্ভাব্য বস্তুকে প্রাথমিক ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সংক্ষিপ্তভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

এক : যা পরিপূর্ণভাবে মঙ্গলময়, যেখানে অঙ্গলের নামনিশানাও নেই।

দুই : যেখানে মঙ্গলের পরিমাণ অধিক তবে অমঙ্গল কম।

তিন : অমঙ্গল অধিক আর মঙ্গলের পরিমাণ কম।

চার : মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ সমান।

পাঁচ : শুধুই অমঙ্গল, মঙ্গলের চিহ্ন মাত্র নেই।

এ পাঁচ প্রকার বস্তুসমুহের মধ্যে শেষের তিন প্রকারের কোন অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে নেই। প্রথম দুই প্রকার বস্তু- ই বিশ্ব জগতে বিদ্যমান।"[২৯]

তথ্যসূত্র :

১। রাডার : RADAR একটি বিশেষ ধরনের ইলেকট্রোনিক্স (Electronics) যন্ত্র। এই বিশেষ ধরনের রেডিও ইলেকট্রোন্কি যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য বস্তুর আবস্থান দূরত্ব, প্রকৃতি, দিক, গতি, উচ্চতা ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভূল (প্রায়) তথ্য নির্ণয় করা হয়। আবার RADAR যন্ত্রের সাহায্যে দেশের আকাশ সীমানায় অনুপ্রবেশকারী বিমান শত্রু না মিত্র তা নির্ণয় করা সম্ভব। অবশ্য উল্লেখিত ক্ষেত্রে এক বা একাধিক RADAR ব্যবহার করা হয়।

২। আল্লাহকে জানা, পৃঃ ২৭- ২৮। অনুবাদ : মিয়া আউয়াল।

৩। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ : জন ক্লোভার মোনসামা। অনুবাদ : আহমাদ আরাম, চতুর্থ প্রকাশ, তাবরীয, ইরান, পৃঃ নং- ৩৯।

৪। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ : জন ক্লোভার মোনসামা। অনুবাদ : আহমাদ আরাম, চতুর্থ প্রকাশ, তাবরীয, ইরান, পৃঃ নং- ২৮৬।

৫। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ : জন ক্লোভার মোনসামা। অনুবাদ : আহমাদ আরাম, চতুর্থ প্রকাশ, তাবরীয, ইরান, পৃঃ নং- ৫৬।

৬। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ, পৃঃ ৬৯, ৭০।

৭। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ, পৃঃ ৭৯।

৮। ‘কিয়াস’ একটি আরাবী শব্দ। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Syllogism। তর্কশাস্ত্রে দুইটি বাক্য থেকে একটি ফলাফলে পৌঁছার নীতিগত যুক্তি ও দলীল বিশেষের নাম কিয়াস। যেমন : এ পুস্তকটি সুন্দর, আর সুন্দরকে মানুষ ভালবাসে সুতরাং এ পুস্তকটিকে মানুষ ভালবাসে। এ ধরণের নির্ভুল ফলাফলে পৌঁছার নীতিগত নাম হল কিয়াস।

৯। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ, পৃঃ নং ২০০- ২০২।

১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ১৮- ১৯।

১১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮- ১৭৯।

১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৮- ২৩০।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩- ৪৪।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৯- ২৬০।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৯- ১৮০।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৭।

১৮। তাওহীদ সাদুক, পৃঃ ২৩১, নূতন প্রিন্ট।

১৯। তাওহীদ মুফায্যাল, পৃঃ ৫৫, নাজাফ প্রিন্ট।

২০। শারহ্ আল্ উসুল আল খামসা, পৃঃ ১৮২।

২১। মাকালাত আল্ ইসলামিয়িন, খণ্ড ১, পৃঃ ২২৪।

২২। আল- আসফার, খণ্ড ৬, পৃঃ- ১১৮।

২৩। নাহজুল বালাগ্বা, খুতবা নং- ১।

২৪। আস সিরাত আল্ মুসতাক্কিম, পৃঃ ৩২।

২৫। আল্ ইমামাহ্ ওয়াস সিয়সাহ্, ইবনে কুতাইবা, খণ্ড ১, পৃ : ১৭১।

২৬। আশআরী ও মু'তাযিলীদের আক্বীদা বিশ্বাস বিস্তারিত অবগত হবার জন্য পড়ুন, কিতাব আল মাসায়েল ফি আল খেলাফ বাইন আল বাসরিয়্যিন ওয়াল বাগদাদীয়্যিন : আবু রশিদ সাঈদ বিন মোহাম্মদ বিন সাঈদ আন্ নিশাবুরী, বার্লিন, জার্মান, হস্তলিখিত কপি।

২৭। উসুলে কাফি, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৬০, কিতাব আল্ আকল ওয়াল জাহল, হাদিস নং- ১২।

২৮। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পড়ুন : Theology Of Al- Shaikh Al-Mufied (উ. ৪১৩/১০২২)

২৯। আল্ আসফার, খণ্ড- ৭, পৃঃ ৬৮।

সূচীপত্র :